মার্চ ২০০৭ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

গা ছমছমে

আট-ভূতের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সুচিত্রা ভট্টাচার্য
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
দুলেন্দ্র ভৌমিক
অমিতাভ পাল
পিনাকী ঘোষ
শ্যামল দত্তচৌধুরী
ইন্দ্রনীল সান্যাল

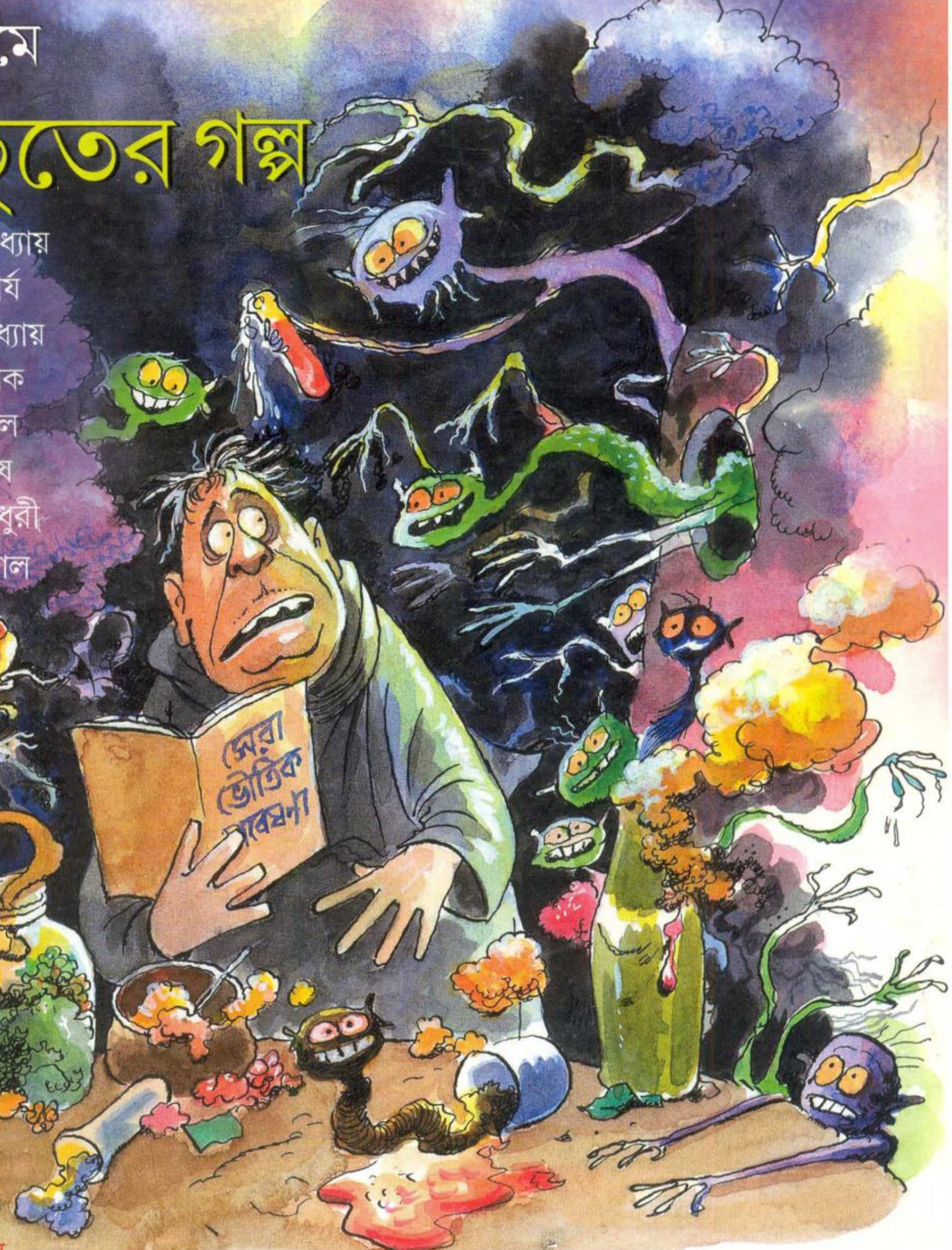

মজাদার গোয়েন্দা কমিক্স

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল (তৃতীয়াংশ)

রণদেব বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার

বিশ্বকাপে প্রতিটি দলের বাছাই ১৫ জন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

Dabur
www.dabur.com

এবার আপনি বাঁচুন প্রাণভরে কেননা টেনশন থাকবে দূরে

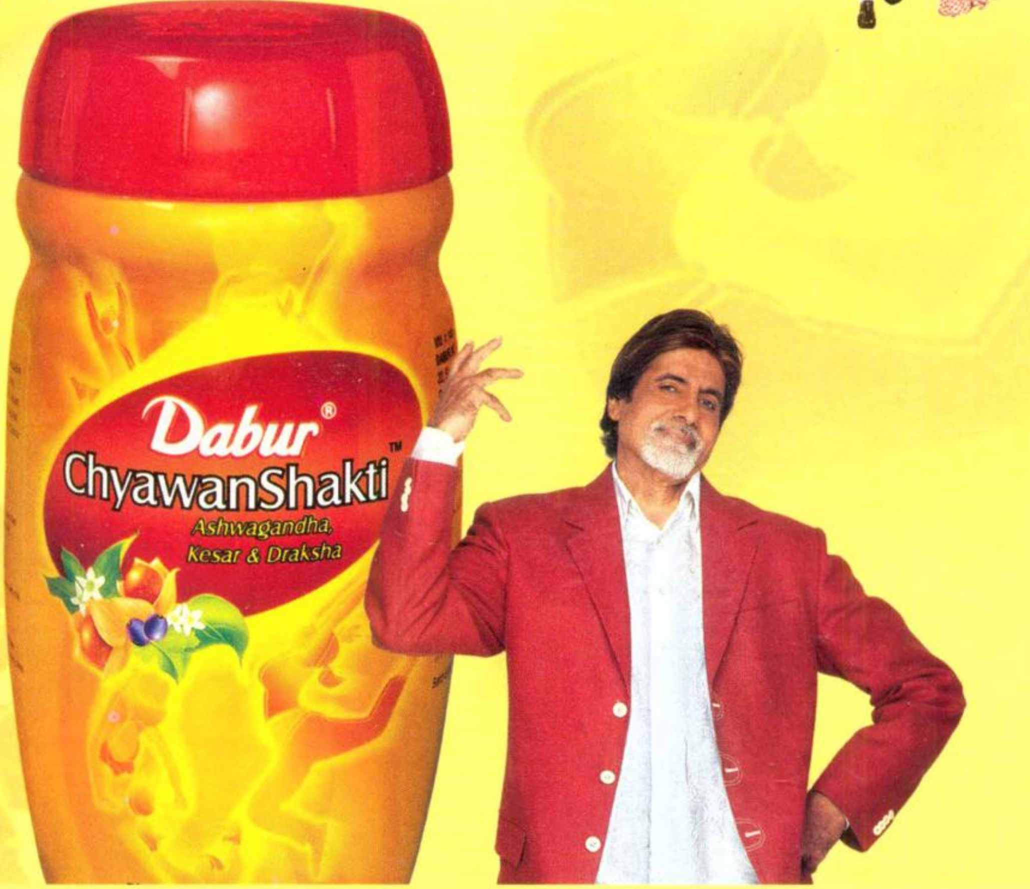

ডাবর চ্যবনশক্তির অশ্বগন্ধা এবং কেসর শক্তি, দেয় টেনশন থেকে মুক্তি।

আজকের এই ব্যস্তসমস্ত অ্যাকটিভ জীবনযাত্রার নতুন অবদান হল টেনশন। 24 ঘণ্টার মধ্যে অফিস, বাড়ি, বাচ্চা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব সামলানোর চেষ্টা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক দু দিক থেকেই নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, না অফিস সামলানো যায়, না ঘর।

এই টেনশন যাতে আপনার জন্যে মুশকিল না হয়ে ওঠে তার জন্যে ডাবর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আয়ুর্বেদ এক্সপার্টস্‌গণ বিশেষভাবে আপনার জন্য তৈরী করেছেন 46 টি বাছাবাছা গুণেভরা প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত অশ্বগন্ধা, কেসর সমৃদ্ধ ডাবর চ্যবনশক্তি। প্রতিদিন এর দু চামচ আপনাকে শক্তি দেবে আর করে তুলবে আপনাকে একদম অ্যাকটিভ যাতে টেনশন থাকে দূরে আর আপনি জীবনকে উপভোগ করতে পারেন প্রাণভরে।

কেসর ঃ একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, রুচিকর এবং উদ্দীপক।

অশ্বগন্ধা ঃ শারীরিক শক্তি বাড়ায় এবং মানসিক টেনশনকে দুর করে। পিত্ত ও কফ-এর দোষকে ভারসাম্য যুক্ত রাখে।

Dabur® ChyawanShakti™

টেনশন থাকে দূরে, আপনি বাঁচেন প্রাণভবে।

টেনশন সামলানোর বিশদ তথ্য সূচনার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেজ্ঞদের **stresscarenaturally@dabur.com** তে ই.মেইল করুন অথবা ডাবর চ্যবনশক্তি, ডাবর ইণ্ডিয়া লি., পো.অ. বক্স নং 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, 201010 (ইউ.পি) কে লিখুন।

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ১১ সংখ্যা ফাল্গুন ১৪১৩ মার্চ ২০০৭

গা ছমছমে আট-ভূতের গল্প

'ভূত নেই' আর 'ভূত আছে' এই দুই বিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূত। পৃথিবী জুড়ে ভূত নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক ভূতের গল্প-উপন্যাস, তৈরি হয়েছে অনেক ভূতের সিনেমা। ভূতের গল্প পড়তে ভালবাসে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ। তাই ভূত থাকুক আর নাই থাকুক, ভূতের গল্প আছে। জমজমাট আটটি ভূতের গল্প থাকল এই সংখ্যায়।

আয়নার মানুষ ৬ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ড্রাগন-লুডো ১১ সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মাধবীকুঞ্জ ১৬ সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ললিত ভবন ২২ দুলেন্দ্র ভৌমিক

রবিনসন ক্রুসোর ভূত ৩০ অমিতাভ পাল

স্লিপি হলোর জঙ্গল ৩৫ পিনাকী ঘোষ

ভূতের গন্ধ ৩৯ শ্যামল দত্তচৌধুরী

পাহাড়ি উইলসন ৪৮ ইন্দ্রনীল সান্যাল

অন্যান্য পাতায়

ক্যাম্পাস ১০

পাঠকের পাতা ২৭

কুইজ ৫৩

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৬০

হাসছি দ্যাখো ৬০

অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৬১

মজাদার গোয়েন্দা কমিক্স (তৃতীয়াংশ)

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল ৪৩

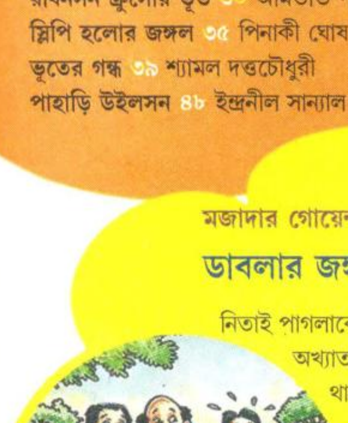

নিতাই পাগলাকে নাকি খুন করেছে প্রোফেসর শম্ভু। গোপালপুরের অখ্যাত কবি ভৈরব ভূত নিয়ে জমজমাট কয়েকটি কবিতা লিখে থানার দারোগাকে শোনাতে গেল। ছদ্মবেশে সেখানে হাজির গোয়েন্দা চন্দ্রকান্ত। এর পর কালীচরণ আর ভৈরব কোথায় গেল? ভৈরব কবিতার খাতাখানাও সঙ্গে রাখল কেন?

গল্প: সুদীপ্ত নাগ

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ: দেবাশিস দেব

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

খেলাধুলো

১৬টি বিশ্বকাপ বাহিনীর বাছাই যোদ্ধারা... ৬২

বাংলার মনোজ ভারতের আশা ৬৪ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

রণদেবের দিকে তাকিয়ে ভারত ৬৫ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

পাখি এবার বিক্রমগড়ে (তৃতীয়াংশ) ৫৪

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

হস্টেলে ভাল লাগছিল না। পাখি গেল বিক্রমগড়ে জিনিয়াদের বাড়ি জিনিয়ার সঙ্গে। রাজপ্রাসাদের মতো সাদা দোতলা বাড়ি। দাদু ব্রজেন দত্ত দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তারপর দাদু বিক্রমগড়ে এসে ওঠেন। একদিন তাঁর আশি হাজার টাকার চেক কেউ ভাঙিয়ে নিল। আর তারপরই খুন হলেন ব্রজেনবাবু। কে খুন করল তাঁকে? পাখি কৌতূহলী হয়ে উঠল। কী ঘটল তারপর?

Swirl
Sundancer
Spark
Blaze
Octane
Cyclone
WAGON
Rotor BMX
Street Racer
Miss India
Ruby
এসে গেল
HERO
DTB
বেরিয়ে আসুন বদ্ধ অবস্থা থেকে

HERO CYCLES

10 Crore Cycles | Glorious Years

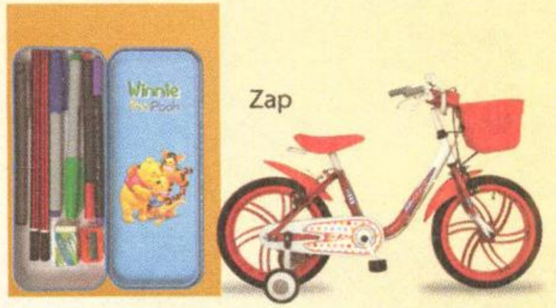

চান বা না চান, জীবন এক বাক্স থেকে অন্য বাক্সের আশে পাশেই ঘুরতে থাকে। আপনি আপনার জীবন কে এমনই কোন বাক্সে বন্দী করে রেখে দিতে পারেন অথবা মেয়েদের, ছেলেদের এবং বাচ্চাদের জন্যে তৈরী হীরো-র নতুন ও টি বি (OTB) সাইকেলের রেঞ্জ থেকে উপভোগ করতে পারেন জীবনের ভরপুর আনন্দ কে। তাহলে, তৈরী হয়ে যান, হাজার হোক - এ তো আপনারই ব্যাপার।

আয়নার মানুষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শক্তপোক্ত মানুষ হলে কী হয়, গদাধর আসলে বড় হা-হয়রান লোক। তিন বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে তার কোনওক্রমে চলে, বাস্তুজমি মোটে বিঘেটাক। তাতে তার বউ শাকপাতা, লাউ-কুমড়ো ফলায়। দুঃখে কষ্টে চলে যাচ্ছিল কোনওক্রমে। কিন্তু পরানবাবুর নজরে পড়েই তার সর্বনাশ।

পরানবাবু ভারী ভুলো মনের মানুষ। জামা পরেন তো ধুতি পরতে ভুলে যান, হাটে পাঠালে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন, জ্যাঠামশাইকে 'ছোটকাকা' ডেকে বিপদে পড়েন। লোকে আদর করে বলে 'পাগলু পরান'। তবে পরানবাবু মাঝে-মাঝে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। একদিন গুরুপদকে বললেন, "ওরে সাধুচরণ, চারদিকে চোর। খুব চোখ রাখিস বাপু!"

তা সত্যিই সেই রাতে গুরুপদর বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল।

আর একদিন লক্ষ্মীকান্তকে বলে বসলেন, "রজনীকান্ত যে! তা বিষ্ণুপুরে বেশ ভাল আছ তো ভায়া!"

লক্ষ্মীকান্তর বিষ্ণুপুরে যাওয়ার কথাই নয়, যায়ওনি কোনওদিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে একটা মাস্টারির চাকরি হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেল, "পরানবাবু ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।"

অনেকেরই সে কথা বিশ্বাস হল। গাঁয়ের মাতব্বর শশিভূষণ একবার পরানবাবুর খোঁড়া কুকুর ভুলুকে প্রকাশ্যে 'ল্যাংড়া' বলায় খুব রেগে গিয়ে পরানবাবু বলেছিলেন, "দ্যাখো নিশিবাবু, সব দিন সমান যায় না। ভুলু যদি ল্যাংড়া হয় তো তুমিও ল্যাংড়া।"

অবাক কাণ্ড হল, দিনসাতেক বাদে শশীবাবু গোয়াল ঘরের চালে লাউডগা কাটতে উঠে একটা সবুজ সাপ দেখে আঁতকে উঠে চাল থেকে পড়ে বাঁ পায়ের গোড়ালি ভাঙেন। মাসটাক তাঁকে নেংচে-নেংচে চলতে হয়েছিল।

তা সেই পরানবাবু একদিন গদাধরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি যেন কে হে! মুখখানা চেনা-চেনা ঠেকছে!"

"আজ্ঞে, আমি গদাধর লস্কর। চেনা না ঠেকে উপায় কী বলুন! এই গাঁয়েই জন্ম-কর্ম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আপনার বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে কতবার গেছি, মনে নেই? পথেঘাটে হরদম দেখাও হচ্ছে।"

খুবই অবাক হয়ে পরানবাবু বললেন, "বটে! তা তুমি করো কী হে বাপু?"

"আজ্ঞে, এই একটু চাষবাস আছে।

তিন বিঘে জমিতে সামান্যই হয়।"

নাক কুঁচকে পরানবাবু বললেন, "এঃ, মোটে তিন বিঘে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ও বেচে দাও।"

"বলেন কী বাবু! বেচলে খাব কী?"

ভারী বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে পরানবাবু বললেন, "খাবে? কত খাবে হে হলধর? খেয়ে শেষ করতে পারবে ভেবেছ! হুঁঃ, খাবে!"

কথাটা অনেকের কানে গেল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বললেন, "ওরে গদাধর, পরান হল বাকসিদ্ধাই। যা বলে, তাই ফলে! ভালয় ভালয় জমিজমা বেচে দে বাবা।"

শুনে ভারী দমে গেল গদাধর। শুধু একটা খ্যাপাটে লোকের কথা শুনে এরকম কাজ করাটা কি ঠিক হবে? জমি সামান্য হোক, বছর বছর সামান্য যে ফসলটুকু দেয়, জমি বেচলে যে তাও জুটবে না!

তার বউ ময়না ভারী ধর্মভীরু মেয়ে। ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়েছে, ষষ্ঠী, শিবরাত্রি ব্রত-উপবাস সব করে। সেও শুনে বলল, "পরানবাবু কিন্তু সোজা লোক নয়। যা বলে তাই হয়।"

এসব শুনে ভারী ধন্দে পড়ে গেল গদাধর। তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি নেই, দূরদর্শিতা নেই, জমি চাষ করা ছাড়া আর কোনও কাজও সে পারে না। একটা পাগল লোকের কথায় ঝুঁকি নেওয়াটা ভারী আহাম্মকি হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজনের তাড়নায় আর বউ ময়নার তাগাদায় অবশেষে সে জমি বেচে এক পোঁটলা টাকা পেল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। এই ক'টা টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরোবে। তারপর কী যে হবে! ভেবে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিপদ কখনও একা আসে না। জমি-বেচা কয়েক হাজার টাকা বালিশের নীচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে ছিল গদাধর। খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ, ঘুমটা বটে একটু গাঢ়ই হয় তার। কিচ্ছু টের পায়নি। সকালে উঠে বালিশ উলটে দেখল, তলাটা ফাঁকা। দরজার খিলও ভাঙা।

ফের মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল সে।

থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই। থানা পাঁচ মাইল দূর। তার মতো চাষাভুষো থানায় এত্তেলা দিলে কেউ পুঁছবেও না। তার কাছে টাকাটা অনেক বটে, কিন্তু পুলিশ শুনে নাক সিঁটকোবে।

ময়নারও মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মোলায়েম গলায় বলল, "ভেঙে পড়ার

কী আছে! আমার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে দু' দিন তো চলুক।"

নুন-ভাত, শাক-ভাত খেয়ে ক'টা দিন কাটল বটে, কিন্তু তারপর আর চলছে না।

ময়না বলল, "চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। দরকার হলে তুমি মুনিশ খাটবে। আমি লোকের বাড়িতে কাজ করব। এ গাঁয়ে ওসব করলে তো বদনাম হবে।"

"বাপ-পিতেমোর গাঁ ছেড়ে যাব?"

"তবে কি মরবে নাকি?"

কাহিল গলায় গদাধর বলল, "তাই চলো।"

পাছে কেউ দেখতে পায়, সেই ভয়ে সন্ধের পর দু'টি পোঁটলা নিয়ে দু'জন গাঁ ছেড়ে রওনা হল।

গাঁ ছেড়ে বেরোতে না-বেরোতেই প্রচণ্ড কালবোশেখির ঝড় ধেয়ে এল। আকাশে ঘন বিদ্যুতের চমক, বাজ পড়ার পিলে চমকানো আওয়াজ আর তুমুল হাওয়া। দু'জনে হাত ধরাধরি করে পড়ি কি মরি ছুটতে লাগল। অন্ধকারে পথের মোটে হদিশই পেল না। শুধু টের পাচ্ছিল, হাওয়া তাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝোপ, জঙ্গল, মাঠঘাট পেরিয়ে তারা দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। বৃষ্টির তোড়ে তাদের জামাকাপড়, পোঁটলাপুঁটলি ভিজে জবজব করছে। দমসম হয়ে যাচ্ছে তারা। বাতাসের শব্দে আর বাজের আওয়াজে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। হাঁ করলেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কালবোশেখির নিয়ম হল, সে বেশিক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি কমল। কিন্তু চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না।

দু'জনে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গদাধর বলল, "এ কোথায় এলুম!"

ময়না বলল, "কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভয় করছে।"

জমিজমা আর টাকাপয়সা সব হাতছাড়া হওয়ায় গদাধরের আর ভয়ডর নেই। সে ময়নার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, "আর ভয়টা কিসের?"

ময়না বলল, "চলো, ফিরে যাই।"

গদাধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, "ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? এ কোন জায়গাটায় এসে পড়লুম তাই বা কে জানে? পথঘাট আন্দাজ করা কি সোজা? ঝড়ের ধাক্কায় অনেকটা এসে পড়েছি। চলো, দেখি একখানা গ্রামট্রাম পাওয়া যায় কিনা!"

অন্ধকারে ঝোপজঙ্গল ভেঙে তারা ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। গ্রাম বা লোকবসতি পেলেই যে আশ্রয় মিলবে এমন ভরসা নেই। উটকো লোককে কেই-বা আদর করে ঘরে জায়গা দেয়? আজকাল যা চোর ডাকাতের উপদ্রব!

একটা জঙ্গলমতো জায়গা পেরোতেই সামনে একটা আলো দেখতে পেল গদাধর। বলল, "ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে! চলো, দেখা যাক, মাথা গোঁজার জায়গা মেলে কিনা!"

সামনে এগিয়ে একখানা মাঠকোঠা দেখা গেল বটে, তবে তার বেশ দৈন্যদশা। সামনের ঘরে একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ করে গদাধর ভারী বিনয়ের গলায় বলল, "আমরা বড় দুঃখী মানুষ। মশাই, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে?"

ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, "ভিতরে এসো, দরজা ভেজানো আছে।"

দু'জনে ভারী জড়সড়, ভয়ে-ভয়ে ভিতরে ঢুকল। ঘরের কোনে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, সামনে একটা তক্তপোষ, তাতে গোটানো বিছানা, কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা, কিছু হাঁড়িকুড়ি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

গদাধর গলাখাঁকারি দিয়ে ভারী নরম সুরে বলল, "আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। উৎপাত করতেই এসেছি বলতে পারেন। তবে বিপদে পড়েই আসা। আমরা বড় দুর্দশায় পড়েছি কিনা!"

কে যেন ভরাট গলায় বলে উঠল, "দুর্দশার তো কিছু দেখছি না হে! কে বলল দুর্দশায় পড়েছ? একটু হাওয়া ছেড়েছিল আর দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, এই তো! তা চাষিবাসিকে তো ঝড়ে-জলে কতই কাজ করতে হয়।"

"তা বটে," বলে গদাধর হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, "যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো দাওয়াতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেব'খন।"

"দাওয়ায়! দাওয়ায় কেন হে? দিব্যি ঘরদোর রয়েছে, দাওয়ায় থাকবে কোন দুঃখে? ভিতরের ঘরে যাও, শুকনো কাপড়টাপড় পাবে। পরে নাও গে। উনুনে আঁচ দেওয়া আছে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।"

ময়না ফিসফিস করে বলল, "গলা পাচ্ছি বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!"

গদাধরও ভড়কে গিয়ে বলল, "তাই তো!"

ময়না বলল, "জিজ্ঞেস করো না!"

গদাধর ফের হাত কচলে বলল, "আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন আজ্ঞে? সামনে এলে একটু পদধূলি নিতুম।"

"ও বাবা, পদধূলি বড় কঠিন জিনিস। খুঁটির গায়ে একটা হাতআয়না ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ?"

গদাধর ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, ভিতরের দরজার পাশে কাঠের খুঁটিতে একটা ছোট্ট হাতআয়না ঝুলছে বটে।

"আয়নাখানা পেড়ে ওর ভিতরে তাকাও।"

গদাধর অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নাটা পেড়ে তুলে ধরতেই এমন আঁতকে উঠল যে, একটু হলেই সেটা পড়ে যেত হাত থেকে। আয়নার ভিতরে একখানা সুড়ুঙ্গে লম্বা মুখ। গোঁফ আছে। জুলজুলে চোখ। মাথায় বাবরি চুল। ভয়ের কথা হল, সে মুখের ঠোঁট নড়ছে আর কথা বেরিয়ে আসছে।

দু'জনেরই ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

আয়নার লোকটা বলল, "ওরে বাপু, আগে তো প্রাণ রক্ষে হোক, তারপর দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকলে থেকো।"

ময়না আর গদাধর কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ময়নাই প্রথম কথা কয়ে উঠল, "আমরা বড্ড ভয় পাচ্ছি যে!"

"বলি ভয়টা কীসের, অ্যাঁ! এই জন্যই বলে লোকের উপকার করতে যাওয়াটাই আহাম্মকি।"

গদাধর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "না না, ওর উপর কুপিত হবেন না, আমরা না হয় ভয়ডর সব গিলে ফেলছি।"

"ভাল। টপ করে ওসব ফালতু জিনিস গিলে পেটে চালান করে দাও। দিয়েছ?"

ময়না আর গদাধর ঘনঘন ঢোক গিলে যেন একটু সামলে নিল। গদাধর বলল,

"নাঃ, এখন আর তেমন বুক ঢিবঢিব করছে না। তোমার করছে ময়না?"

"নাঃ। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, এই যা!"

আয়নার লোকটা বলল, "ওতেই হবে। এখন গিয়ে রান্নার জোগাড়যন্তর করে ফ্যালো।"

গদাধর আমতা-আমতা করে বলল, "ফস করে অন্দরমহলে ঢুকব? কেউ যদি কিছু বলে?"

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, "বলার মতো আছেটা কে হে? এই আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর জনমনিষ্যি নেই। যাও যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া ধরে ফেলবে।"

কথা না বাড়িয়ে তারা ভিতরের ঘরে এসে দেখল, দিব্যি ব্যবস্থা। আলনায় কয়েকখানা পাটভাঙা ডুরে শাড়ি, দু'টো ধোয়া ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ রয়েছে।

কুয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে, ভেজা কাপড় বদল করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, উনুনে আঁচ উঠে গেছে। চালডাল খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল। আলু, লঙ্কা, ফোড়ন, তেল সবই অল্পস্বল্প রয়েছে।

ময়না বলল, "হ্যাঁ গা, আয়নার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাদের সঙ্গে খাবেন কিনা।"

গদাধর গিয়ে আয়নাটা নিয়ে এল, তারপর সুড়ুঙ্গে মুখখানার দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "আজ্ঞে, আপনি পেরসাদ করে না দিলে কোন মুখে খিচুড়ি খাই বলুন! ময়নার বড় ইচ্ছে আপনাকেও একটু ভোগ চড়ায়।"

"না হে বাপু, ওসব আমার সহ্য হয় না। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমরা খাও।"

কী আর করা, অন্যের বাড়িতে ঢুকে এরকম রেঁধেবেড়ে খাচ্ছে বলে ভারী সঙ্কোচ হচ্ছে তাদের। তবে খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তারা লজ্জার সঙ্গেই পেটপুরে খেয়ে নিল।

তারপর দু'জনে ক্লান্ত শরীরে আর ভরা পেটে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গদাধরের মনে হল, গত কাল ঝড়ে-বৃষ্টিতে পড়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় একটা আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে। ময়নাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে ময়না বলল, "দুজনে কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে?"

"তা হলে ব্যাপারটা কী?"

"তার আমি কী জানি!"

বাইরে কে যেন "কে আছ হে! কে আছ?" বলে চেঁচাচ্ছিল। গদাধর তাড়াতাড়ি উঠে সদর দরজা খুলে দেখল, নাদুসনুদুস একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দড়িতে বাঁধা দু'টো হালের বলদ, একটা দুধেল গাই, আর-একটা হাল।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "এই নাও ভাই, ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত হাল-গোরু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আর এই নাও, এক বছরের হাল-গোরুর ভাড়া আর দুধ বাবদ দাম। সাতশো টাকা আছে।"

গদাধর জিভ কেটে পিছিয়ে গিয়ে বলল, "না না, ছিঃ-ছিঃ, এসব আমার পাওনা নয়। আমাকে কেন দিচ্ছেন?"

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না দিলে কি রেহাই আছে হে! ষষ্ঠীপদ ঘাড় মটকাবে। বুঝে নাও ভাই, কাল রাতেই ষষ্ঠীপদ হুকুম দিয়ে গেছে।"

"আজ্ঞে, ষষ্ঠীপদ কে বটেন?"

"কেন, পরিচয় হয়নি নাকি? বলি, সে এখন আয়নার মধ্যে ঢুকেছে বলে তো আর গায়েব হয়ে যায়নি। তার দাপটে এখনও সবাই থরহরি কাঁপে। ওই পুবে খালধারের জমিটা তোমার। দশ বিঘে আছে।"

কিছুই বুঝতে পারল না গদাধর। লোকটা চলে যাওয়ার পর গোরু আর বলদদের নিয়ে গোয়ালে বেঁধে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে সে গিয়ে আয়নাটা পেড়ে আনল। কিন্তু দিনমানে আয়নায় আর সেই সুড়ুঙ্গে মুখখানা দেখা গেল না। নিজের বোকা-বোকা হতভম্ব মুখখানাই দেখতে পেল সে।

এর পর আর-একজন রোগাপানা লোক এসে হাজির। সঙ্গে মুটের মাথায় দু'টো ভরা বস্তা।

"এই যে ভায়া, আমি হচ্ছি শ্যামাপদ মুদি। দু'বস্তা চাল দিয়ে গেলুম। ষষ্ঠীপদর হুকুম তো, আর অমান্যি করতে পারি না। এই দু' বস্তাই পাওনা ছিল তোমাদের। আর এই হাজারটা টাকা।"

গদাধর কথা কইতে পারছে না। কেবল ঢোক গিলছে। জিভ, টাগরা সব শুকনো।

একটু বেলার দিকে একজন বউমানুষ এসে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ময়নার কাছে হাজির। একটা পোঁটলা খুলে কিছু সোনার গয়না বের করে বলল, "নাও বাপু। তোমার জিনিস বুঝে নাও। মোট আট গাছা সোনার চুড়ি, বাঁধানো নোয়া, বিছেহার, এক জোড়া বালা আর ঝুমকো দুল।"

ময়না অবাক হয়ে বলল, "এসব আমার হবে কেন?"

"তা জানি না, ষষ্ঠীপদ গচ্ছিত রেখেছিল। এখন হুকুম হয়েছে, তাই দিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি তো ষষ্ঠীপদবাবুকে চিনিই না।"

"চিনবে বাপু, এ গাঁয়ে থাকলে তাকে না চিনে উপায় আছে? তা তোমাদের কপাল ভাল যে, তার নেকনজরে পড়েছ। তার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকি কিনা!"

সারাদিনে আরও অনেকে এসে অনেক জিনিস দিয়ে গেল। কেউ দা আর কুড়ুল, কেউ শীতলপাটি, কেউ কুয়োর বালতি আর কাঁটা, কেউ কাঠের টুল, কেউ বাসনকোসন বা কড়াই আর হাতা, এমনকী একগাছ ঝাঁটা অবধি। সবই নাকি ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত রাখা জিনিস।

গদাধর আর ময়নার দিশেহারা অবস্থা। গরিব হলেও তারা লোভী লোক নয়। এসব জিনিস তাদের ঘরে ছিল না। তার উপর ষষ্ঠীপদর রহস্যটাও তাদের মাথায় সেঁধোচ্ছে না।

খুব ভাবনাচিন্তার মধ্যেই দিনটা কাটল তাদের। সন্ধে হতেই হঠাৎ সেই বাজখাঁই গলা, "সব জিনিস ফেরত দিয়ে গেছে তো?"

গদাধর তাড়াতাড়ি আয়নাটা পেড়ে দেখল, সেই সুড়ুঙ্গে মুখ। কাঁপা গলায় বলল, "এসব কী হচ্ছে বলুন তো মশাই? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

লোকটা ধমক দিয়ে বলল, "বেশি বুঝবার দরকার কী তোমার? কাল থেকে তেঁতুলতলার জমিতে হাল দিতে শুরু করো।"

"আমরা কি তবে এখানেই থাকব?"

"তবে যাবে কোন চুলোয়?"

ময়না পিছন থেকে ফিসফিস করে বলল, "ওগো, রাজি হয়ে যাও।"

গদাধর গদগদ হয়ে বলল, "যে আজ্ঞে!"

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)

আমাদের স্কুল

১৯১৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় কয়েকজন মানুষের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের স্কুল। পরাধীন এবং অবিভক্ত ভারতে শুরু হয় এই স্কুলের পথচলা। এখন জেলার মধ্যে আমাদের স্কুল রীতিমতো বিখ্যাত। এই স্কুলে এখন প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রী পড়াশোনা করে, শিক্ষিকা রয়েছেন ৫৪জন। ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষিকাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের মানসিক এবং নৈতিক চরিত্রগঠনে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন আমাদের স্কুলের শিক্ষিকারা। এঁদের কাছে তাই আমরা চিরঋণী। ছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেয়। এই সব অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের সফল হওয়ার নেপথ্যে স্কুলের শিক্ষিকাদের ভূমিকাও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই ছাত্রীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সফল হওয়ার প্রেরণা জোগান।

শিক্ষক দিবসে

৫ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। প্রতি বছর এই দিনটি সারা দেশে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আমাদের স্কুলেও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশন করে ছাত্রীরাই।

খেলাধুলোতেও মেতে থাকি

শুধুমাত্র পড়াশোনা নিয়েই আমরা থাকি না। এর পাশাপাশি নানা ধরনের খেলাধুলোতেও আমরা সারা বছর মেতে থাকি। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে আমাদের স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্কুলের সব ছাত্রীই অংশগ্রহণ করে। আমরা প্রতি বছর এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করি।

দেশনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে 'স্বাধীনতা দিবস' এবং 'প্রজাতন্ত্র দিবস' পালন করা হয় আমাদের স্কুলে। এই দু'টি অনুষ্ঠানে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পর শুরু হয় প্রভাতফেরি।

লেখাগুলো লিখেছে স্নেহা সাউ, স্বাগতা মাইতি এবং সুদীপা ঘোড়ই, এরা সকলেই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী।

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে ভুলো না।

আমাদের ঠিকানা:

আনন্দমেলা
ক্যাম্পাস বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ড্রাগন-লুডো

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বনবাংলোর সামনের লনটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তিন বন্ধু। রনি, পিকলু আর জোজো। চৌকিদার কাছেই থাকে, এইমাত্র বাড়ি গেল সে। ফিরবে কাল সকালে। বাংলোর এই চত্বরটায় তারা তিনজন ছাড়া এখন আর কেউ নেই।

সাতকোশিয়ার এই জঙ্গলে পৌঁছতে তিন বন্ধুকে ঘাম ঝরাতে হয়েছে বিস্তর। সেই কাল রাত্তিরে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সকালে কটক, একপেট শিঙাড়া-জিলিপি সাঁটিয়ে বাসে চেপে চার ঘণ্টা পর আঙুল। ছোট্ট জমজমাট শহরটায় একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞেস করে খুঁজে বের করতে হল বনদপ্তরের অফিস। সরকারি কাগজপত্র নিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফের বাস। অবশেষে ওড়িশার এই জঙ্গলটায় তিন মূর্তি যখন এসে নামল, সূর্য ডুবে গিয়েছে, সন্ধে প্রায় হয়-হয়।

তবে হ্যাঁ, পরিশ্রম সার্থক। জায়গাটায় এসে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছে। তিন দিক জঙ্গল দিয়ে ঘেরা বনবাংলোটি পাহাড়ের একদম প্রান্তে। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মহানদী। আধো অন্ধকারে নদী তেমন দেখা গেল না বটে, তবে তার কলকল অতি স্পষ্ট। এমন চমৎকার নিসর্গ ভাল না লেগে পারে?

অভ্যর্থনাও এখানে মন্দ হয়নি। থাকার ঘরটি বেশ পছন্দসই। আছে চার-চারখানা সিঙ্গল খাট, আলমারি, আয়না, চেয়ার, একটা বড়সড় টেবিল...। লাগোয়া বাথরুমও আছে। আর দেখভাল করার চৌকিদারটি তো ম্যাজিক জানে। ঘরে ঢুকে স্নান সেরে তরতাজা হতে না-হতেই সে একথালা পেঁয়াজি আর আলুর চপ নিয়ে হাজির। রাতেও দারুণ মুরগি বানিয়েছিল। কষা-কষা, ঝাল-ঝাল। ঠিক যেমনটা রনি-পিকলু-জোজো পছন্দ করে। লোভে পড়ে আট-দশটা করে রুটি খেয়ে ফেলেছে এক-একজন, পেট এখন একেবারে আইঢাই।

সেই হাঁসফাঁস ভাব কাটাতেই চলছে এখন পদচারণা। উত্তেজনাতেও ফুটছে তিনজন। সবে হায়ার সেকেন্ডারি দিয়ে জীবনে এই প্রথম শুধু বন্ধুরা মিলে বেড়ানোর ছাড়পত্র পেয়েছে। তাদের খুশি যেন আর ধরছে না। তার উপর এমন এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ! চারদিকে ছমছম করছে অন্ধকার, লাখ-লাখ ঝিঁঝিপোকার ডাক, অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিভছে, বৈশাখের বাতাস শিরশির শব্দ তুলছে জঙ্গলে। গাঢ় নীল আকাশে ঝকঝকে তারার মেলা। এমনটি তারা আগে কখনও দেখেইনি।

পিকলু তো আনন্দে গান গেয়ে উঠল। রনিও গলা মিলিয়েছে। জোজো

কোত্থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়েছিল। সেটাকে ঘোরাচ্ছে তলোয়ারের ভঙ্গিতে। হঠাৎ বলে উঠল, "অ্যাই, এখন একটা অভিযান চালাবি?"

গান থেমেছে। পিকলু জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"জঙ্গলে। চল, টর্চ নিয়ে একটা পাক খেয়ে আসি।"

"এই রাতদুপুরে? হেঁটে-হেঁটে? মাথা খারাপ?" রনি চোখ ঘোরাল, "শুনলি না, চৌকিদার কী বলে গেল! হাতি, বুনো শুয়োর, ভল্লুক, কোনও কিছুর কমতি নেই এই সাতকোশিয়ায়। বাঘও নাকি আছে দু'-চার পিস।"

"সো হোয়াট? চোখে আলো ফেললে জন্তুজানোয়ার কাছে ঘেঁষে না, আমি জানি।"

"তোর বই পড়া জ্ঞান বন্ধ রাখ।" পিকলু ফোড়ন কাটল, "ভুলে যাস না, অন্ধকারে সাপখোপও বেরোয়।"

"হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তি বটে। টর্চ মেরে সাপকে বাগে আনা যাবে না," জোজো মাথা নেড়ে বলল, "তা হলে নদীর পারে নামি চল। পাথর বেয়ে-বেয়ে।"

"অসম্ভব। অন্ধকারে পা পিছলে হাড়গোড় ভাঙি আর কী!" পিকলু অন্য প্রস্তাব দিল, "তার চেয়ে বরং রুমে গিয়ে তাস খেলি। ব্রে, দেখি কে আগে গাধার ডাক ডাকে!"

কথাটা রনি-জোজোরও মনে ধরেছে। কিন্তু ঘরে এসে কপালে হাত। যাঃ, তাসের প্যাকেট আনাই হয়নি।

রনি বেজার মুখে বলল, "তা হলে আর কী, আড্ডাই হোক। আমি তোদের একটা জব্বর ভূতের গল্প শোনাতে পারি।"

জোজো তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "ধুৎ, ভূতে আমার ইন্টারেস্ট নেই। আমি ভূত বিশ্বাসই করি না।"

"সে তো আমরাও করি না। তা বলে গল্প শুনতে দোষ কী? চারদিক শুনশান, ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে, ভূত কিন্তু এখন জমবে ভাল।"

"অবাস্তব গল্প শুনবই না। তার চেয়ে শুয়ে পড়া ঢের ভাল। কাল তা হলে কাকভোরে উঠে বেরোতে পারব।"

অগত্যা বিছানায় লম্বা হওয়ার তোড়জোড়। পিকলু আর জোজো মশারি টাঙাচ্ছিল, হঠাৎই রনি চেঁচিয়ে উঠল, "এই দ্যাখ, এখানে কী রয়েছে!"

অবাক হওয়ার মতোই জিনিস বটে। টেবিলের ড্রয়ারে বড়সড় সাইজের একখানা লুডোর বোর্ড! ঘুঁটি-ছক্কাও মজুত সঙ্গে!

ব্যস, আর তিন মূর্তিকে পায় কে! বসে গেল লুডো নিয়ে। বোর্ডটা একটু অদ্ভুত, শুধু সাপলুডোই আছে। উঁহু, ঠিক সাপও নয়, সাপগুলোর মুখ অনেকটা যেন ড্রাগনের মতো। লেজের কাছটাও কাঁটা-কাঁটা। মইয়ের বদলে ছোট-বড় গাছ। ছবিগুলো আঁকাও হয়েছে ভারী নিপুণ হাতে। কেমন জ্যান্ত-জ্যান্ত দেখায়!

চালু হয়ে গিয়েছে খেলা। টপাটপ ছক্কা গড়াচ্ছে বোর্ডে। টুপটুপ এগোচ্ছে ঘুঁটি। গাছের ঘরে দান পড়তে সাঁই উপরে উঠে গেল, সাপের মুখে পড়ে সাঁৎ নেমে এল লেজে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দারুণ জমে গেল খেলা। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে বোর্ডের উপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে তিন মূর্তি।

তখনই শুরু হল ঘটনাটা।

হঠাৎই একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। কাছেই আওয়াজটা এত জোর, মনে হল, যেন ঘরেই ঢুকে পড়েছে পাখিটা। মুহূর্তের জন্য চমকেছিল তিন খেলুড়ে, পরক্ষণে ফের মন দিয়েছে ঘুঁটিতে। পিকলু বোর্ডে ছক্কা গড়িয়ে দিয়ে বলল, "পাঁচ পড়েছে। এবার আমি বড় গাছ বেয়ে টঙে যাব।"

জোজো খপ করে ছক্কাটা তুলে ভরে নিয়েছে কলকেতে। ভুরু কুঁচকে বলল, "কোথায় পাঁচ! তোর তো তিন পড়েছিল!"

রনিও সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিয়েছে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও স্পষ্ট তিন দেখেছি।"

পিকলু অবাক মুখে বলল, "যাঃ বাবা, আমি কি মিথ্যে বলছি?"

"সে তুইই জানিস।"

"তুই পড়েছিস ড্রাগনের মুখে। যা, একদম নীচে চলে যা।"

অগত্যা পিকলুকে মেনে নিতেই হয়। তিনজনের দু'জন যখন বলছে, সে নিজেই নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। ড্রাগনের লেজে নেমে এল পিকলুর নীল ঘুঁটি।

এবার জোজোর দান। কলকে নেড়ে ফেলেছে ছক্কা। উল্লসিত স্বরে বলল, "আমার পড়েছে চার। গাছে চড়ব আমি। সোজা তিরানব্বইতে পৌঁছে যাব।"

ছক্কাটা কলকেতে ভরে রনি বলল, "তুইও পিকলুর মতো গুল মারছিস? পড়ল দুই, আর বলছিস চার?"

পিকলু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "কেন চালাকি করছিস জোজো? দেখাই তো গেল দুই পড়েছে!"

"এটা কিন্তু তুই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বলছিস।" জোজো তেতে গেল, "আমি ভুল দেখতেই পারি না।"

"বললেই হল? তুই তো ইচ্ছে করে ভুল দেখছিস।"

"চালাকি ছাড়ো চাঁদু। সুড়সুড় করে ড্রাগনের মুখে যাও।"

জোজো নেমে এল বটে, তবে গজগজ করছে, "এটা কিন্তু অন্যায় হল, এটা কিন্তু অন্যায় হল..."

হ্যা-হ্যা হেসে রনি কলকে নাড়ল জোরে-জোরে। ছক্কা চেলে বলল, "হুররে, পুট পড়েছে। এবার আমি সাঁইসাঁই উপরে উঠব।"

পিকলু ছক্কাটা পুরে নিল কলকেয়। বাঁকা সুরে বলল, "তুইও জোজোর লাইন ধরলি? পড়ল তিন, আর বলছিস এক?"

জোজো আঙুল নেড়ে বলল, "নো চালাকি রনি। তিনকে তুই এক বানিয়ে দিলি?"

রনি দপ করে জ্বলে উঠল, "চালাকি তো তোরা করছিস! নিজেদের চালাকি ধরা পড়ে গিয়েছে তো, তাই এখন আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা।"

পিকলু গরগর করে উঠল, "একদম বাজে বকবি না। প্ল্যান করে তোরা আমাকে হারাতে চাইছিস।"

"শাটআপ।" জোজো হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "মোটেই আমাকে জড়াবি না। তোরাই প্ল্যান করে আমাকে ডাউন দিচ্ছিস।"

"অ্যাঅ্যাহ, চুরি করে আবার তেজ দ্যাখো! হাজার বার বলব, তুই, রনি দু'জনেই চালাকি করছিস।"

"চোপ, চোপ। তুই একটা চাতুরির মন্ত্রী, আর জোজো শয়তানির রাজা!"

"মুখ সামলে, রনি। আমি কিন্তু তোর দাঁত ভেঙে দেব।"

"আমার হাত নেই? আমি চালাতে জানি না?"

"ভেবেছিস কী, অ্যাঁ? দু'টোকেই এমন মারব না!"

ব্যস, বেধে গেল ধুন্ধুমার। যে যাকে পারছে হাত চালাচ্ছে। রনির পাঞ্চ খেয়ে

ঘরের কোনে ছিটকে পড়ল পিকলু। কোনওক্রমে উঠে ষাঁড়ের মতো তেড়ে গিয়ে জোজোর পেটে লেফ্‌ট হুক মারল একখানা। জোজোর আপার কাটে রনি বিছানায় চিৎপাত। চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুলল পিকলু। রনি এলোপাথাড়ি ঘুসি ছুড়ছে অবিরাম। জোজো একখানা রামগাঁট্টা মারল পিকলুর চাঁদিতে। সঙ্গে-সঙ্গে রনিকে ছেড়ে জোজোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিকলু। বক্সিংয়ের পর এবার মল্লযুদ্ধ। কে যে কখন কাকে ধরাশায়ী করছে, বোঝে কার সাধ্যি!

হঠাৎই আবার সেই রাতচরা পাখির ডাক। আওয়াজটা এবার আরও আজব, যেন খ্যাকখ্যাক হাসছে। থেমেও গেল ঝুপ করে। ওমনি চরাচর পলকে নিঝুম।

কী কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞও স্তব্ধ সহসা! তিন যুযুধান নিশ্চুপ কয়েক পল। খানিক পরে রনি মিনমিন করে উঠেছে, "এই, আমরা মিছিমিছি মারামারি করছিলাম কেন রে?"

পিকলু কাতর গলায় বলল, "আমি জীবনে কোনও দিন কারওর সঙ্গে ঝগড়া করিনি... আজ আমিই কিনা তোদের গায়ে হাত তুললাম!"

জোজোর স্বরও করুণ, "ছি ছি, খুব খারাপ কাজ হল। শেষে কিনা সামান্য লুডো খেলা নিয়ে মারপিট!"

অনুতপ্ত তিন বন্ধু বসল যে যার খাটে। আপশোস চলছে কৃতকর্মের জন্য। পিকলু বলল, "হঠাৎ আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল কেন বল তো?"

জোজো বলল, "এই ড্রাগনমার্কা বোর্ডটাই যত নষ্টের মূল।"

রনিও একমত, "নিশ্চয়ই ওই বোর্ডটার কোনও অশুভ শক্তি আছে। ছক্কা আর ঘুঁটিগুলোরও।"

"যা বলেছিস! কিছু একটা গড়বড় আছেই। নইলে আমরা তিনজনই ভুলভাল দেখা শুরু করলাম কেন?"

"ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলা যায় না?"

"খুব যায়।"

ভাবামাত্র কাজ। জোজো গিয়ে হেঁচকা টানে দু' টুকরো করেছে বোর্ড। রনি আর পিকলুও ছিঁড়ছে মহোৎসাহে। ঘুঁটিগুলোকেও মটমট করে ভাঙল, প্লাস্টিকের কলকেটা পিষল পায়ে। ছক্কার ফুটকিগুলো নখ দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মুছে দিল। তারপর সবসুদ্ধ জানলার বাইরে ছুড়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল তিন সঙ্গী।

বিছানায় পড়তে না-পড়তেই ঘুম। পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল, শরীর-মন ঝরঝরে, তাজা। এমনকী গা-হাত-পায়েও এতটুকু ব্যথা নেই। দাঁতটাঁত মেজে তিন মূর্তি বেরিয়েছে ঘর থেকে। দিনের আলোয় বাংলোর লন থেকে নদী দেখে তারা তো মুগ্ধ। বেশ চওড়া নদী, স্রোতও আছে, জলটাও ভারী টলটলে। নদীর ওপারেও পাহাড়, জঙ্গল। দুই সবুজ পাহাড়ের মধ্যিখান দিয়ে বয়ে চলা মহানদীতে নৌকোও চলছে দিব্যি। খানিক গিয়ে বাঁক নিয়েছে নদী, ওপারের পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে।

তিন বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করল দৃশ্যটা। চৌকিদার এসে গিয়েছে বহুক্ষণ, আলুপরোটা রেডি, গপাগপ খেয়েই ছুটেছে পাশের কুমিরপ্রকল্প দর্শনে। নানান সাইজের মেছোকুমির আছে খাঁচায়। এদের নাম যে ঘড়িয়াল, তাও জানা হয়ে গেল। পিকলু ক্যামেরা এনেছে, ছুঁচলো-মুখ ঘড়িয়ালদের ফোটো তুলল পটাপট। তারপর মহানদীতে হুটোপুটি করে স্নান। বাংলোয় ফিরে চৌকিদারের রাঁধা সুস্বাদু ডিমের ঝোল, ভাত খেয়ে আবার হইহই করে ঘুরতে বেরনো। এবার অরণ্যে।

হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা ভিতরে চলে গিয়েছিল তিনজনে। যত এগোয়, ততই যেন টানে জঙ্গল। দু' ধারে শাল, সেগুন, শিমুল, মহুয়া, জারুল, আরও কত নাম না জানা গাছের ভিড়। অচেনা এক বুনো গন্ধে ম ম করছে বাতাস। পাতা ঝরছে টুপটাপ। মাঝে-মাঝে পিকপিক ডেকে উঠছে পাখি। বাকি সময়টা বন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ। কোথাও চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লেই গায়ে যেন কাঁটা দেয়। মনে হয়, জঙ্গলের প্রাণীরা যেন তাদের আড়াল আবডাল থেকে দেখছে।

জীবজন্তুর দেখা অবশ্য মিলল না বিশেষ। ওয়াচ টাওয়ারে উঠে দু'টো-চারটে হরিণ দেখে ফিরতে হল। যাকগে যাক, বাঘ-ভল্লুক নয় নাই দেখা হল, জঙ্গল ভ্রমণের শিহরণই বা মন্দ কী!

সন্ধেবেলা বাংলোয় ফিরে শুরু হয়েছে আড্ডা। সারা দিনের স্মৃতি রোমন্থন। ডিজিট্যাল ক্যামেরায় তোলা ফোটোগুলো দেখাচ্ছিল পিকলু, পুটুস-পুটুস মন্তব্য করছিল রনি আর জোজো। রাত ন'টা নাগাদ চৌকিদার খেতে ডাকল। আহারপর্ব শেষ হওয়ার পরে কালকের মতোই চলে গেল চৌকিদার।

আবার বাংলোয় শুধু তারা তিনজন। রনি, পিকলু, জোজো। আর আছে ছমছমে অন্ধকার। ঝিঝিপোকার ডাক। লক্ষ-লক্ষ জোনাকি। নদীর কুলকুল শব্দ। এবং বিদ্যুৎহীন ঘরে হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো।

খানিকক্ষণ বাংলোর লনে ফুরফুরে হাওয়া খেয়ে ঘরে এসেছে তিন বন্ধু। ঢুকেই জোজো বলল, "কাল সকালেই তো ফেরা, আজ এখন কী করা যায়?"

রনি বলল, "সেই ভূতের গল্পটা বলি? দারুণ ইন্টারেস্টিং। আমার কাকা যখন অসমে ছিলেন..."

কথার মাঝখানেই হঠাৎ টেবিলের সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল পিকলু, "অ্যাই রনি, অ্যাই জোজো, এদিকে আয়।"

দৌড়ে গেল দু'জনে। পিকলু টেবিলের ড্রয়ারটা খুলেছিল, ভিতরে চোখ পড়তেই কেঁপে উঠল রনি, জোজো।

কালকের সেই লুডোর বোর্ডটা! ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দেওয়ার পরেও আবার সেটা বিরাজ করছে স্বস্থানে। ঘুঁটি, কলকে, ছক্কা সমেত।

জোজো অস্ফুটে বলল, "এটা কী করে সম্ভব?"

পিকলু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমিও তো তাই ভাবছি।"

রনি বলল, "ছুঁস না ওটাকে। ধরিস না।"

তবু কী যেন ঘটে গেল। সম্মোহিতের মতো বোর্ডটা হাতে তুলে নিয়েছে জোজো। ফিসফিস করে বলল, "চল না, খেলি।"

পিকলু বিড়বিড় করে বলল, "খেললে হয়।"

রনির ঠোঁট নড়ল, "খোল তবে। শুরু কর।"

ড্রাগন-লুডোয় ফের মেতেছে তিন বন্ধু। তাদের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। ছায়াগুলো তিরতির করে কাঁপছে।

ঠিক তখনই রাতচরা পাখিটা আবার ডেকে উঠল বিশ্রীভাবে। হুবহু কালকের মতো!

ছবি: দেবাশিস দেব

পরীক্ষার গোলকধাঁধার চোখধাঁধানো চাবিকাঠি

পরীক্ষা নিয়ে প্যাঁচালো চিন্তার প্রকৃত সমাধান খুঁজতে গিয়েই আয়োজিত হয়েছিল হরলিকস ও সানন্দা বীরবল ওয়র্কশপ। আজকের দুনিয়ার ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে গেলে যেতেই হবে হাজারো পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তাতে সাফল্য পেতে গেলে কী কী করা দরকার তা ভাবতে বসলে চক্ষু চড়কগাছ।

খুদে পড়ুয়া তো বটেই, এগ্‌জ্যামের জুজুবুড়ি আজকাল চেপে ধরছে মা-বাবাকেও। নোটস জোগাড়, টিউশন ঠিক করা এবং সামগ্রিক প্রস্তুতির জন্য আরও হাজার কাজ। কিন্তু কোন পথটা হবে সবচেয়ে ভাল তা খুঁজে পাওয়া মোটেও মুখের কথা নয়।

কারও বাচ্চা আবার সবকিছুতেই এক্সপার্ট। কিন্তু কোনওভাবেই বইখাতার কাছে বসানো যায় না।

এ সব হাজারো পরিচিত সমস্যার অপরিচিত সমাধান এনেছিল ওয়র্কশপ। নানা বিশেষজ্ঞ ও সেলিব্রিটিদের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মন্তব্য আর টিপস হাসি এনেছিল চিন্তিত মায়েদের মুখে।

সে দিনের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সাইকোলজি বিভাগের ড: প্রশান্ত রায়, অ্যাপিজে স্কুলের অধ্যক্ষ রীতা চ্যাটার্জি, ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড: জয়দেব রায়, চাইল্ড স্পেশালিস্ট, ড: স্বপনকুমার রায়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে স্বপনকুমার সরকার

এবং হরলিক্সের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পূজা গড়ি, দেবাশিস বাবু এবং অভিমন্যু দত্ত। অন্যরকম উপস্থিতি ছিল সেলিব্রিটি মাদার জুন মাল্য ও পরমা-র। অগণিত তারার সমাবেশে অনুষ্ঠান ছিল উদ্ভাসিত। আসর বসেছিল স্যাডল, হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল ও মোক্ষ-তে, জানুয়ারি ২০ ও ২৭ এবং ফ্রেব্রুয়ারির ৩ তারিখে। পরীক্ষায় সাফল্য পেতে গেলে শুধু প্রস্তুতি ছাড়াও চাই মানসিক চাপ কমানোর টিপস। মনোযোগ ও মনোবল বাড়ানোয় সেই নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রতিটি শিশুর মানসিক

গঠন আলাদা। নিজস্বতার অবমাননা না করে শিশুকে পরিচালনা করতে গেলে মা-বাবাকে হতে হবে যথেষ্ট সচেতন। এই সচেতনার সঠিক পথ জানা গিয়েছিল সেই দিন। পরীক্ষার আগে হুড়োহুড়িতে অভ্যস্ত না হয়ে সন্তানকে সময় দিন গোড়া থেকেই। ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকুন তার মানসিক স্থৈর্য। তার জন্য তৈরি করুন নিজস্ব রুটিন। পাশের বাড়ির ছেলেটি হয়তো দিনে দশ ঘন্টা পড়ে। তার দেখাদেখি আপনিও চাইবেন না যে আপনার ছেলেও বই হাতে বসে থাক সারাক্ষণ। আপনার সন্তানের প্রয়োজনমত রুটিন বানান আপনি। তাতে থাক আপনার সুচিন্তিত মমতার স্পর্শ। অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে সন্তানকে অযথা চাপের মুখে ফেলবেন না।

আসলে সব মা-বাবাই চান সন্তানের সফল ভবিষ্যৎ। সে দিনের কর্মশালায় সেই আশাকে বাস্তবে পরিণত করার চাবিকাঠি জানা গিয়েছিল ভালভাবে। নানা মুল্যবান পরামর্শের শ্রোতা হতে পেরেছিলেন উৎসুক অভিভাবকগণ।

ভাল অভিজ্ঞতা সর্বদাই আনন্দের। সে দিন উপস্থিত সকলেই মেনে নিয়েছিলেন একবাক্যে যে তাঁরা সকলেই পরিতৃপ্ত। কেননা আপনার সোনাকে সেরা জিনিসের সন্ধান দিতে আপনি সবসময়ই ইচ্ছুক। আর আপনার ইচ্ছেমত ইচ্ছে পূরণ হয়েছিল কর্মশালায়। দেরি না করে তাই লেগে পড়ুন নামীদামি পরামর্শকে সঙ্গী করে আপনার সন্তানকে সফল করে তুলতে। যে কোনও পরীক্ষায় সে যেন পায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল! আর আপনি পান রত্নগর্ভার উপাধি।

Horlicks

মাধবীকুঞ্জ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট একফালি স্টেশন বড়ডিহা। ড্রাইভার যদি অন্যমনস্ক থাকেন, সম্ভাবনা আছে স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার। এখন তা হল না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি কাঁপতে-কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কম্পার্টমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন বিকাশবাবু। প্ল্যাটফর্ম এতটাই নিচু, সিঁড়ি শেষ হওয়ার পর খানিকটা লাফাতে হল।

ট্রেনটি বেশি সময় নষ্ট করল না এখানে। হুইসল দিতে-দিতে এগিয়ে চলল। এখন মাঝদুপুর। চারপাশটা ফাঁকা বলেই রোদে মিশে আছে চোরা ঠান্ডা। কলকাতায় এবার তো শীতের নামগন্ধ নেই। বড়ডিহার আবহাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বিকাশবাবু প্ল্যাটফর্মের চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর মতো শহুরে কাউকে দেখছেন না। প্যাসেঞ্জার বলতে সকলেই গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা। মাথায় কাঠকুটোর বোঝা, হাতে ছাগল বাঁধা দড়ি, কারওর কাঁধে পুঁটুলি...ধীরে-ধীরে স্টেশন ছেড়ে রেললাইন ডিঙিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে তারা। বিকাশবাবু এখন কাকে জিজ্ঞেস করবেন 'মাধবীকুঞ্জ' বাড়িটি কোথায়?

দুশ্চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বিকাশবাবু দেখলেন, টিকিট ঘর থেকে বেরিয়ে একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। চেকার নিশ্চয়ই। এঁর থেকেই জেনে নিতে হবে ঠিকানা। পকেট থেকে টিকিট বের করলেন বিকাশবাবু। ভদ্রলোক দূর থেকেই বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। বের করতে হবে না। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, কে টিকিট কেটেছে, কে কাটেনি।"

বিকাশবাবু খুব খুশি হলেন ভদ্রলোকের আপ্যায়নে। বড়ডিহায় মনে হচ্ছে ক' দিন খারাপ কাটবে না। মানুষটি সামনে এসে বললেন, "আমি হচ্ছি এই স্টেশনের সিগনালম্যান কাম বুকিং ক্লার্ক কাম স্টেশনমাস্টার কাম চেকার, এটসেট্রা এটসেট্রা। এখন বলুন, যাবেন কোথায়? অফিসঘরে বসে আপনাকে দেখছিলাম ঠিকানা জানার জন্য লোক খুঁজছেন।"

বিকাশবাবু নিজের গন্তব্য বললেন। একবারেই চিনতে পারলেন ভদ্রলোক। বললেন, "মাধবীকুঞ্জ, মানে পরিমল চৌধুরীর বাড়ি তো?"

ঘাড় হেলিয়ে হ্যাঁ বলে নিশ্চিন্ত হলেন বিকাশবাবু। স্টেশনমাস্টার বললেন, "হাঁটতে হবে অনেকটা। এখানে রিকশা, ভ্যানগাড়ি কিছুই পাবেন না। একটা লোকও দিতে পারব না, যে আপনার ব্যাগ বয়ে দেবে।"

"দরকার নেই। এই একটা লাগেজ আমি একাই বইতে পারব। কাইন্ডলি রাস্তার ডিরেকশনটা যদি বলে দেন।" বললেন বিকাশবাবু।

স্টেশন চত্বরের বাইরে আঙুল দেখালেন ভদ্রলোক। বললেন, "ওই সোজা রাস্তাটি ধরে আধ ঘণ্টা হাঁটতে হবে। পৌঁছবেন ন্যাশনাল হাইওয়েতে। বাঁ দিক ধরে আরও মিনিট পনেরো হাঁটা। ওখানেই দেখবেন ছড়িয়েছিটিয়ে বেশ কিছু একতলা পাকা বাড়ি। শহরের মানুষ শখে বাড়ি বানিয়ে তালা মেরে রেখেছেন। একমাত্র পরিমলবাবুই অনেক দিন ধরে আছেন। আপনি পরিমলবাবুর কে হন?"

"বন্ধু। সেই স্কুলবেলা থেকে।" বললেন বিকাশবাবু।

"আগে কখনও এখানে আসেননি, না? খবরটা পেয়েই এলেন?"

স্টেশনমাস্টারের কথায় হোঁচট খেলেন বিকাশবাবু। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন খবরটার কথা বলছেন?"

"বউদির চলে যাওয়া।" মন খারাপের গলায় বললেন ভদ্রলোক।

"মানে?" ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন বিকাশবাবু।

স্টেশনমাস্টার বললেন, "ও, আপনি বুঝি জানেন না! তা হলে তো খুব খারাপ লাগবে শুনে। পরিমলবাবুর স্ত্রী এক মাস হল মারা গিয়েছেন।"

শুনেই বুকটা হায়-হায় করে উঠল বিকাশবাবুর। বললেন, "সে কী? কেন, কী হয়েছিল?"

"ম্যালেরিয়া। খুব খারাপ ধরনের। দু' দিনের জ্বরে চলে গেলেন। সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সুযোগই পাওয়া যায়নি।"

বিকাশবাবুর মন এতটাই দমে গেল, ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন, কলকাতার ফেরার ট্রেন ক'টায়? কিন্তু ফিরে গেলে এই মানুষটি পরিমলের কানে ঠিক তুলে দেবেন, কলকাতার এক বন্ধু বড়ডিহায় এসেও ফিরে গিয়েছেন। চেহারার বর্ণনা দিলে বাল্যবন্ধুকে চিনতে অসুবিধে হবে না পরিমলের।

স্টেশনমাস্টার হাঁটছেন। সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন বিকাশবাবু। মাস্টারমশাই কথা বলার লোক পান না। তাই কথা বলে চলেছেন প্রাণ খুলে, "আমরা তো ভেবেছিলাম, বউদি মারা যাওয়ার পর পরিমলদা এখানকার বাড়ি বিক্রি করে চলে যাবেন। উনি অসুস্থ মানুষ, এখানে ওঁকে দেখবে কে? কিন্তু গেলেন না। দিব্যি কাজের মানুষের ভরসায় থেকে গেলেন। আসলে ভালবেসে ফেলেছেন জায়গাটা। না বেসেও উপায় নেই, এত শান্তশিষ্ট প্রকৃতি..." কথা বলতে-বলতে বেখেয়ালে স্টেশনমাস্টার রাস্তায় এসে পড়েছেন।

বিকাশবাবু বললেন, "এবার আমি যেতে পারব। আপনাকে তো পরের ট্রেনের সিগনাল দিতে হবে।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো।" বলে স্টেশনের দিকে ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিলেন মাস্টারমশাই।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিকাশবাবু চলেছেন বন্ধুর বাড়ি। এখানকার প্রকৃতি সত্যিই বড় মনোরম। লাল মাটির চওড়া রাস্তা। কিছু দূর অন্তর বড়-বড় গাছ। দূরে খেতজমি, মাটি নিকনো কুঁড়েঘর। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে আবছা টিলা। কিন্তু কোনও কিছুই বিকাশবাবুর মনটাকে চাঙা করতে পারছে না। অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছিলেন পরিমলবাবুর কাছে। ক'টা দিন প্রচুর আড্ডা মেরে কাটাবেন। বন্ধুর স্ত্রী মাধবীও খুব হাসিখুশি, গল্পবলিয়ে মেয়ে। আসর জমাতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, বন্ধুকে এখন সান্ত্বনা দিতে যেতে হচ্ছে।

বড়ডিহায় আসার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই ছিল। পরিমল বহুবার চিঠি লিখে আসতে বলেছেন। সময় করে উঠতে পারছিলেন না বিকাশবাবু। চাকরিতে উঁচু পদে ছিলেন। কাজের ভীষণ চাপ। এক মাস হল রিটায়ার করেছেন। ভাবছিলেন, কোথাও ঘুরে এলে হয়। মনে পড়ে গেল পরিমলের কথা।

বিকাশবাবু বিয়ে-থা করেননি। দাদার সংসারে ভাইপো ভাইঝিদের নিয়ে থাকেন। বাড়িতে বলেছেন, "বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। ক' দিন পর ফিরব, বলা যাচ্ছে না।"

ভাইপো বলেছে, "যাও, ঘুরে এসো। রিটায়ার লাইফের এটাই তো মজা।"

কিন্তু মন বলছে, টুরটা বেশি দিনের হবে না। পরিমলের বুকে এখন শোকের পাথর। কেন যে এখনও এখানে পড়ে আছে কে জানে! কলকাতায় ওদের পৈতৃক বাড়ি। যৌথ সংসার। পরিমল অনায়াসে ওখানে গিয়ে থাকতে পারে। বড়ডিহায় পরিমল এসেছিল শরীর সারাতে। চাকরি করতে-করতে স্ট্রোক হয়েছিল পরিমলের। শরীরের এক সাইড প্যারালিসিস হয়ে যায়। বেশ কয়েক মাস ফিজিওথেরাপি করার পর হাঁটাচলা শুরু করে। শুধু বাঁ হাতটি অকেজো হয়ে যায়। ওই অবস্থায় পরিমল, মাধবী হাওয়া বদল করতে আসে বড়ডিহায়। এতই ভাল লেগে গেল এখানকার জলহাওয়া, তাই বাড়ি কিনে থেকে গেল বরাবরের মতো। পরিমলের পয়সাকড়ির অভাব নেই। নামী উকিল ছিল। ছেলে ডাক্তার হয়ে এখন আমেরিকায়। শেষ জীবনটা স্বামী-স্ত্রী মিলে শান্তিতে প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। হল না। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল মাধবী।

একথা সেকথা ভাবতে-ভাবতে বিকাশবাবু কখন যেন পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে। বেশ বড় বাগান, বারান্দা নিয়ে একতলা বাড়ি। গেটের থামে 'মাধবীকুঞ্জ' নামটি পাথরে বাঁধানো। বিকেলের ঢলে পড়া হলুদ রোদে বাড়িটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

গেট খুলে হেঁটে গেলেন বিকাশবাবু। বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা মারলেন। ভিতর থেকে গলা ভেসে এল পরিমলের, "কে?"

"আমি," বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল বিকাশবাবুর। কত দিন পর দেখা হবে বন্ধুর সঙ্গে। আনন্দের সাক্ষাৎ নয়। পরিমল এখন বড় একা।

ঘটল ঠিক উলটো। দরজা খুলে বিকাশবাবুকে দেখে পরিমলবাবু আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, "আরে, তুই! একেবারে না বলেকয়ে? আয় আয়..."

একটা হাত সাড়হীন নেতিয়ে আছে পরিমলবাবুর। ডান হাত বন্ধুর কাঁধে রেখে ঘরে নিয়ে এলেন। আরও ভিতরের কোনও ঘরের দিকে গলা তুলে বললেন, "মাধবী, দেখবে এসো, কে এসেছে।"

বিকাশবাবু তো হতবাক। স্টেশনমাস্টার কি ভুল খবর দিলেন? কেনই বা তিনি এরকম অলক্ষুনে কথা জুড়ে দেবেন পরিমলের সঙ্গে! কোনও শত্রুতা আছে কি?

ড্রয়িংরুমের সোফায় বসলেন দু'জনে। অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুকে পেয়ে পরিমলবাবু খুবই উত্তেজিত। অনর্গল কথা বলে চলেছেন। বিকাশবাবু অপেক্ষা করছেন বন্ধুর স্ত্রীর। এক সময় বলেই ফেললেন, "হ্যাঁ রে, মাধবী আসছে না যে!"

"আসবে। হয়তো রান্নাটান্না নামাচ্ছে।" বলেই যেন কোনও শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফেরালেন পরিমলবাবু। ড্রয়িংরুমের ভিতরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওই তো এসে গিয়েছে। দ্যাখো মাধবী, বিকাশ কিন্তু একই রকম আছে। চেহারা দেখলে কে বলবে, রিটায়ার করেছে চাকরি থেকে।"

বিকাশবাবুর চোখ বিস্ময়ে বড়-বড়,

কাউকে দেখতে পেলেন না উনি। কেউ আসেনি এ ঘরে। দরজার পরদাটা নড়েনি এতটুকু। শূন্যের উদ্দেশে কথা বলে চলেছেন পরিমল। বিকাশবাবুর কোনও সাড়া নেই দেখে, পরিমলবাবু বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন, "কী রে, তুই চুপ করে আছিস কেন? এমন ভাব করছিস, যেন চিনতে পারছিস না মাধবীকে!"

বিকাশবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ভীষণ অপ্রস্তুত, অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন। কোনওক্রমে বললেন, "আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না পরিমল।"

"তুইও পাচ্ছিস না! আমি ভেবেছিলাম তুই অন্তত পাবি দেখতে।" হতাশ ভঙ্গিতে কথা শেষ করলেন পরিমলবাবু। বিকাশবাবু হাঁ করে তাকিয়ে আছেন বন্ধুর দিকে, ঠিক কী বলতে চাইছেন বোঝা যাচ্ছে না।

আবার দরজার দিকে তাকালেন পরিমলবাবু। বললেন, "চলে যাচ্ছ। আচ্ছা যাও। আমাদের চা, খাবারটাবার কিছু দিও।"

চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছেন বিকাশবাবু। পরিমল কী উপহাস করছে? সদ্যপ্রয়াত স্ত্রীকে নিয়ে ঠাট্টা মোটেই শোভা পায় না। যদিও পরিমলের মুখে মশকরার চিহ্নমাত্র নেই। মনমরা গলায় বললেন, "তুই চিনলি না বলে মাধবীর খুব অভিমান হয়েছে। খাতির-যত্নের খামতি হলে আমাকে দোষ দিস না।"

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বিকাশবাবুর। একটু ধমকে বলে উঠলেন, "চুপ কর পরিমল, তখন থেকে কী উলটোপালটা বকছিস। ঘরে কেউ আসেনি, কথা বললি কার সঙ্গে? তা ছাড়া মাধবীর মৃত্যুর খবর আমি জানি। ও এখানে আসবে কোথা থেকে!"

বন্ধুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলেন পরিমলবাবু। হঠাৎই বলে উঠলেন, "মাধবী মারা গিয়েছে আমিও জানি। দিঘির মাঠে দাহ করার সময় আমি ছিলাম। শ্মশান থেকে ফিরে বাড়ির দরজা খুলে দেখি, মাধবী বসে আছে সোফায়। চেহারায় অসুস্থতার কোনও ছাপ নেই। অবাক হয়ে বললাম, 'এ কী তুমি!' বলল, 'কী ভেবেছিলে, পুড়িয়ে দিলেই ফুরিয়ে যাব। তোমার দেখাশোনা করবে কে?'

"তারপর যেমনকার তেমন বাড়ির কাজে লেগে গেল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মাধবীকে আমিই শুধু দেখতে পাই। বাড়ির কাজের লোকেরা পায় না।"

এতক্ষণে একটা দিশা পেলেন বিকাশবাবু, মাধবীর মৃত্যুশোক একা বইতে গিয়ে মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে পরিমলের। আত্মীয়স্বজনরা কি জানে, ওর এই অবস্থার কথা? জানলে এভাবে একা ফেলে রাখতে পারত না।

ভাবনার মাঝে বন্ধুকে হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে যেতে দেখলেন বিকাশবাবু। হেঁটে যাচ্ছে সম্ভবত রান্নাঘরের দিকে। পা টেনে-টেনে হাঁটছে। বাঁ হাত লেপটে আছে শরীরের সঙ্গে। বন্ধুর এই করুণ হেঁটে যাওয়া দেখে ভীষণই কষ্ট হল বিকাশবাবুর। ঠিক করলেন, বন্ধুকে বলবেন, তাঁর সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যেতে।

বেশ কিছুটা সময় গেল। পরিমলবাবু ফিরছেন না। একা বসে আছেন বিকাশবাবু। বাড়িটি খুবই নির্জন জায়গায়। পাখির কিচকিচ ডাক ছাড়া কোনও শব্দই আসছে না বাইরে থেকে। রান্নাঘরের টুং টাং আওয়াজ অবশ্য আসছে। চোখ যায় দেওয়াল ঘড়ির উপর, বন্ধ হয়ে আছে। পরিমল বেচারা একা মানুষ, সব দিকে খেয়াল রেখে উঠতে পারছে না। কী করছে এতক্ষণ ধরে ভিতরে? সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বিকাশবাবু, পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন পরিমলবাবু। এক হাতে ট্রে, তাতে দু' কাপ চা, স্ন্যাক্স, সেন্টারটেবিলে রাখলেন ট্রে'টা। নিজে সোফায় এসে বসলেন। একটু পরে বিকাশবাবুকে বললেন, "নে, কাপ তোল। চা-পাতা অনেকক্ষণ ভিজিয়ে চা-টা করল মাধবী। ওর সেই বিখ্যাত চা। তোরা খুব পছন্দ করতিস।"

বিকাশবাবু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "চা তো তুই করে নিয়ে এলি।"

"কখন?"

"কখন মানে! এই তো মিনিট দশেক হল, উঠে গেলি আমার সামনে থেকে। চা নিয়ে ফিরলি।"

হাসতে-হাসতে মাথা দুলিয়ে পরিমলবাবু বললেন, "চা-টা খা আগে। ভারী চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তোর মাথাটা দেখছি গিয়েছে।"

কার মাথা গিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাপ তুলে নিলেন বিকাশবাবু। কাপে চুমুক দিতেই অবাক হয়ে গেলেন। দারুণ চা বানিয়েছে পরিমল! অবিকল মাধবীর মতো।

চা পানের পর দু' বন্ধু এসে বসেছেন বারান্দার চেয়ারে। বিকেল এখনও ফুরোয়নি। এ বাড়ির বাগানে ফুটে আছে গাঁদা, জিনিয়া আরও নানারকম ফুল। নিয়মিত না হলেও পরিচর্যার ছাপ আছে। পাঁচিলের বাইরে ইতস্তত বড়-বড় গাছ। ডালপালা, গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু একতলা বাড়ি। আন্দাজ করা যায়, এগুলোই শহুরে শৌখিন মানুষের অবসর যাপনের আস্তানা। বিকাশবাবু গল্পের ফাঁকে ভুলেও আর মাধবীর প্রসঙ্গ আনছেন না। ঠিক করে নিয়েছেন, আজ রাতটা এ বাড়িতে থেকে, কালই পরিমলকে নিয়ে কলকাতায় যাবেন। এখনই একজন মানসিক ডাক্তার দেখানো বড় প্রয়োজন।

কথার ফাঁকে বিকাশবাবু জানতে চাইলেন, "হ্যাঁ রে, তুই যে তখন কাজের লোকের কথা বলছিলি, তাদের তো কাউকে দেখছি না?"

"আছে। বাজার গিয়েছে লক্ষ্মণ। চলে আসার সময় হল। আর-একজন আছে লকাইয়ের মা। সে দিনে একবারই আসে। ঘরদোর মুছে, বাসন মেজে চলে যায়।"

"রাতে কেউ থাকে না?"

"থাকে, লক্ষ্মণ থাকে।"

পরিমলবাবুর কথা শেষ হতে না-হতে গেটের কাছে কে যেন এসে দাঁড়াল। হাতে বাজারের ব্যাগ। পরিমলবাবু বললেন, "ওই যে লক্ষ্মণ এসে গিয়েছে।"

বাগানের রাস্তা ধরে বারান্দায় উঠে এল লক্ষ্মণ। বয়স তিরিশের নীচে। পরিমলবাবু লক্ষ্মণকে বললেন, "গিন্নিমা যা-যা আনতে বলেছিল, এনেছিস?"

ঘাড় হেলায় লক্ষ্মণ। পরিমলবাবু ফের বললেন, "তাড়াতাড়ি ভিতরে যা, গিন্নিমাকে গিয়ে হেল্প কর। আজ বড্ড দেরি করে ফেললি।"

লক্ষ্মণ যাওয়ার আগে অদ্ভুত চোখে বিকাশবাবুর দিকে তাকাল। বড় একটা খটকা লেগে গেল বিকাশবাবুর, লক্ষ্মণ কী করে মেনে নিল, গিন্নিমার ফরমাশমতো বাজার এনেছে? পরক্ষণেই মাথায় এল আসল কারণটা, চাকরি টিকিয়ে রাখার খাতিরে মালিকের পাগলামিতে সায় দিচ্ছে লক্ষ্মণ।

তারপর দু' বন্ধু মেতে গেলেন স্কুল-

প্রতিদিন এক ঘন্টাই যথেষ্ট।

6 লাখেরও বেশি মানুষ লাভবান হয়েছেন।

আর আপনি ?

শুধু বাংলা জানলেই চলবে

ইংরেজি

শিখুন

সহজেই ইংরেজি বলুন

K.V.R. B.Com.,B.L., (Director)

আপনি আপনার ঘরে বসে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই প্রতিদিন ১ ঘন্টা নিজে নিজে শিখলেই যথেষ্ট। আপনি সহজেই ইংরেজি শিখে নিতে পারবেন। আমাদের কোর্স বিশেষরূপে সোজা উদাহরণ সহযোগে সহজ ভাবে তৈরি। এই জন্য নিঃসন্দেহে আপনি ইংরেজিতে সহজেই কথা বলতে পারবেন। এই কোর্সের বর্তমান খরচ **600** টাকা। নীচের কুপন পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠান। আপনার পোস্টম্যানের কাছে টাকা দিয়ে কোর্স নিয়ে নিন। এর পরে আর একটি কোর্স আছে যা চার মাসের কোর্স। এর খরচ অনেক কম, নামমাত্র। ইচ্ছে হলে এই কোর্স নিতে পারেন তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

বিনামূল্যে
200/- টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

6 লাখেরও বেশি মানুষের শেখা ইংরেজি কোর্স।

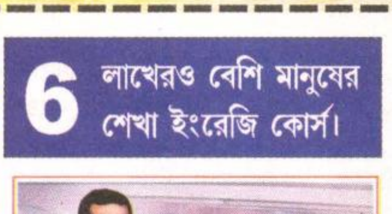

এক দিনের ইংরেজি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কে.ভি.আর. (পুরস্কারবিজয়ী)

এই কুপন পূরণ করে পাঠান

4080

SINCE 1990

KVR INSTITUTE
AWARD WINNER

বিনামূল্যে
200/- টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

New No.203(BEN), Habibullah Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.

আমাকে কে.ভি.আর. (1 মাসের) ইংরেজি কোর্স এবং মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ডাকে পাঠান। আমি পোস্টম্যানকে **600/-** টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব।

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন।

Name: ....

Address: ....

....

.... Pin Code: ☐☐☐☐☐☐

* SERVICE TAX INCLUDED

কলেজবেলার স্মৃতি রোমন্থনে। গল্প বেশি দূর গড়াল না। দরজার দিকে মুখ ফেরালেন পরিমলবাবু। পরদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু বলবে?"

বিকাশবাবু বুঝতেই পারছেন, স্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন তাঁর বন্ধু। স্বাভাবিকভাবেই শূন্য থেকে কোনও কথা ভেসে এল না। পরিমলবাবু যেন শুনতে পেলেন। বিকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাধবী জানতে চাইছে, রাতে রুটি খাবি, না ভাত?"

খামোকা জটিলতায় না গিয়ে বিকাশবাবু বললেন, "ভাত।"

"তার সঙ্গে রুই-পোস্ত করতে বলি? তুই তো ভালবাসতিস।"

"ওই হলেই হল।" দায়সারা উত্তর দিলেন বিকাশবাবু।

পরদার দিকে তাকিয়ে পরিমলবাবু বললেন, "শুনলে তো, জমিয়ে রাঁধো। আমার জন্য আজ ভাতই করো।"

বিকাশবাবু দরজার দিকে তাকাচ্ছেন না। ক্রমশ অসহ্য ঠেকছে এই অবান্তর পরিস্থিতি।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম।" বলে এমনভাবে কথায় ফিরলেন পরিমলবাবু, যেন এইমাত্র তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকে গেলেন।

সন্ধে পড়তে ঠান্ডা বাড়ল। বারান্দায় আর বসে থাকা গেল না, তাই দু' বন্ধু এসে বসলেন ড্রয়িংরুমে। কথা বলতে-বলতে কত সময় গেল দু' জনেরই হুঁশ নেই। দেওয়াল ঘড়িটাও বন্ধ। ঘড়ির কথা তুলতে যাবেন বিকাশবাবু, ঠিক সেই সময় লক্ষ্মণ এসে বলল, "বাবু, মা আপনাদের খেতে ডাকছেন।"

"হ্যাঁ, যাই।" বলে পরিমলবাবু উঠলেন সোফা ছেড়ে। বন্ধুকে বললেন, "কী হল, বসে রইলি কেন? চল।"

বিকাশবাবুর এখন বেশ রাগ হচ্ছে, পরিমলের বিচার-বুদ্ধি কী একেবারেই লোপ পেল! কাজের লোকের মিথ্যে তোষামোদ ধরতে পারছে না। প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন বন্ধুকে, "হ্যাঁ রে, তুই যে বলছিলি, মাধবীকে তুই একাই দেখতে পাস, কাজের লোকেরা পায় না। তোর লক্ষ্মণ তো দেখছি দিব্যি মাধবীর অর্ডার অনুযায়ী কাজ করছে।"

পরিমলবাবু সরলভাবে হেসে বললেন, "না, ওরা এখনও দেখতে পায় না, উপস্থিতিটা টের পায়। আমার ভাগ্য ভাল, মাধবীকে ভূত ভেবে পালিয়ে যায়নি ওরা।"

বিকাশবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর বন্ধু যুক্তি-বুদ্ধির নাগালে নেই। বাক্য ব্যয় করার মানেই হয় না। নিরুপায়ভাবে বন্ধুকে অনুসরণ করে ডাইনিংরুমে এলেন বিকাশবাবু।

টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে খাবার। ধোঁয়া উঠছে, দু'জনে চেয়ারে বসলেন। কাজের লোক লক্ষ্মণ এসে দাঁড়াল, চেহারায় কাঁচুমাচু ভাব। পরিমলবাবু ওকে দেখে বললেন, "কিছু বলবি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, মানে বাবু, আজ রাতে একটু বাড়ি যাব। কাল সকালেই চলে আসব। বাজারে গিয়ে আমাদের পাড়ার একজনের সঙ্গে দেখা হল। বলল, আমার বাবার শরীরটা খারাপ হয়েছে।"

"গিন্নিমাকে বলেছিস?" জানতে চাইলেন পরিমলবাবু।

"বলেছি। উনি বললেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে।"

"নো প্রবলেম। সকালেই চলে আসিস কিন্তু! বাড়িতে গেস্ট আছে। কখন কী দরকার লাগে।"

লক্ষ্মণ এক মুহূর্ত দেরি করল না। হাঁটা দিল সদর লক্ষ করে।

বিকাশবাবু চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন। একটু আগের নাটুকে কথাবার্তা কানে এলেও গুরুত্ব দিলেন না। বন্ধুর মেজাজ যে ভাল নেই বুঝতে অসুবিধে হল না পরিমলবাবুর। বললেন, "আমি জানি, তুই কিছুতেই মেনে নিতে পারছিস না মাধবীর উপস্থিতি। আমি কিন্তু প্রমাণ দিতে পারি মাধবী আছে।"

এই সময় একবার মুখ তোলার কথা বিকাশবাবুর, কিন্তু এতই বিরক্ত যে তুললেন না। পরিমলবাবু বলে চলেছেন, "মেনুটা লক্ষ কর, ভাত বলেছিলাম, হয়েছে। আমি কিন্তু অন্য দিন রুটি খাই। রুই-পোস্তও হয়েছে। তোর সামনে মাধবীকে এইগুলোই আমি রাঁধতে বলেছিলাম, লক্ষ্মণকে বলিনি। তুই ভাবছিস লক্ষ্মণের রান্না খাচ্ছিস।"

এবারও কোনও জবাব দিলেন না বিকাশবাবু। মনে-মনে যুক্তি সাজাচ্ছেন, পরিমল যখন পরদার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল, দূরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে নিয়েছিল লক্ষ্মণ অথবা এই পদ রান্না হওয়ার কথাই ছিল আজ। পরিমল শুধু মেনুটা আবার বলেছে। নিজের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে বিকাশবাবু একটা ছোট্ট খোঁচা দিয়ে বন্ধুকে বললেন, "মাধবী তো আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে পারত। পরে একা-একা খাবে!"

বিষণ্ণ গলায় পরিমলবাবু বললেন, "ওর তো আর খাওয়ার দরকার পড়ে না। শরীরই নেই যখন। প্রথম দিকে আমি বলতাম, বসতে। বসত। মিছিমিছি নষ্ট হত খাবার।"

একথা যদি শহরে বসে বলতেন পরিমলবাবু, বিকাশবাবু নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু বড়ডিহার নির্জনতা এতই ভারী, দমচাপা, বুকটা যেন একটু ছমছম করে উঠল।

রাতে গেস্টরুমে শুয়েছেন বিকাশবাবু। ঘুম আসতে চাইছে না। বাড়ির বাইরে হঠাৎই শুরু হচ্ছে ঝিঁঝির কোরাস, আবার আচমকা থেমেও যাচ্ছে। তখন কী গভীর নিস্তব্ধতা। সেই সময় ধীরে-ধীরে কার যেন পায়ের আওয়াজ ভেসে উঠছে। কেউ যেন হাঁটছে সারা বাড়ি জুড়ে। ভাল করে কান পাতলেন বিকাশবাবু, মনে হচ্ছে পায়ের শব্দ নয়। বন্ধ ঘড়িটা বুঝি চলতে শুরু করেছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! পরিমল তো সারাক্ষণ চোখের সামনেই ছিল, ঘড়িটা চালু করতে দেখা যায়নি। ফের ঝিঁঝির ডাক সমস্ত সংশয় মুছে দিল। বিকাশবাবু শেষ কবে এরকম পরিবেশে ঘুমিয়েছিলেন মনে পড়ছে না। আজ বন্ধুর সঙ্গেই শুতে গিয়েছিলেন। পরিমল বলেছেন, এখানে তো আমি আর মাধবী শোব। তুই গেস্ট রুমে শো। রাতে কোনও দরকার পড়লে ডাকবি।

এই আজগুবি কথার কোনও বিরুদ্ধাচরণ করেননি বিকাশবাবু, গেস্টরুমে এসে শুয়ে পড়েছিলেন। একটি বিষয় ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন, একার পক্ষে পরিমলকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে সবিস্তার পরিমলের মানসিক অবস্থার কথা বলে দু'- তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। তবে যদি পরিমলকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যায়। বিকাশবাবু কাল সকালেই চলে যাবেন। বন্ধুকে বলেছেন সে কথা। সহজে রাজি হয়নি, অনেক করে বোঝাতে হয়েছে। নানা কথা ভাবতে-ভাবতে এক সময়

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বিকাশবাবু। কে যেন ধাক্কা দিয়ে ডেকে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। চোখ কচলে দেখলেন, দরজা অর্ধেক খোলা। ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। কেউ ডেকে দিল বোঝা যাচ্ছে। ঘরে কেউ নেই। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে দেখলেন, টেবিলে ধূমায়িত কাপ। তার মানে পরিমলের ঘুম ভেঙে গিয়েছে আগে। চা রেখে ডেকে দিয়ে গেল। বন্ধুর জন্য খারাপ লাগে বিকাশবাবুর। অসুস্থ শরীর নিয়ে আতিথেয়তা করে যাচ্ছে। কাপে চুমুক দিতে-দিতে বন্ধুর ঘরে এলেন বিকাশবাবু। পরিমলকে ঘুমোতে দেখে এতটুকুও অবাক হলেন না। জানেন, বন্ধুর ঘুমটা আসলে ভান।

পরিমলের বিছানায় বসলেন বিকাশবাবু। আস্তে করে ডাকলেন বন্ধুকে। পরিমলবাবু চোখ খুলে বললেন, "উঠে পড়েছিস? চা দিয়েছে মাধবী? তোর ট্রেন কিন্তু সেই সাড়ে আটটায়।"

বিকাশবাবু স্মিত হাসলেন। হাসিতে কোথায় যেন একটু বন্ধুর প্রতি করুণা লেগে আছে। বললেন, "তুই খাবি না?"

"না। সকালে চা দেয় না মাধবী। এখনই দুধওলা আসবে। দুধের সঙ্গে দেবে বিস্কুট।"

ডোরবেল বেজে উঠল। পরিমলবাবু বললেন, "ওই যে দুধওলা এল।"

বিকাশবাবু দরজা খোলার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন। পরিমল বললেন, "তুই উঠছিস কেন? মাধবী খুলে দেবে।"

বসে পড়লেন বিকাশবাবু। সেকেন্ডখানেক পর সত্যিই যেন শুনতে পেলেন দরজা খুলে দেওয়ার আওয়াজ। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল বিকাশবাবুর।

কতক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরল বোঝা যাচ্ছে না। দেখলেন, আগের মতোই বিছানায় বসে আছে পরিমল। শুধু সামনের দৃশ্যটা একটু বদলে গিয়েছে। বড় মগে চুমুক মারছে পরিমল। মাঝের সময়টা কী ঘটল! কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। নিজেকে সুস্থির করতে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন বিকাশবাবু। বন্ধুকে বললেন, "অনেক দিন তো হল এখানে। এবার কলকাতায় চল। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছাকাছি থাকতে পারবি।"

পরিমলবাবু বললেন, "না রে, এখানেই বেশ আছি দু'জনে। কোনও অসুবিধে তো হচ্ছে না। কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে মাধবীর ঘোর আপত্তি।"

বন্ধুর আবোল তাবোল কথা শুনতে-শুনতে বিকাশবাবু কিছুক্ষণ আগের সময়টা খুঁজে পেলেন। মনে পড়ল, দুধওলাকে তিনিই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। দুধ গরম করে পরিমলকে দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে মনে পড়ল গ্যাস ওভেন অফ করা হয়নি। আসলে অভ্যেস নেই তো!

ওভেন বন্ধ করবার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন বিকাশবাবু। পরিমলবাবু জানতে চাইলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"ওভেনটা জ্বালানোই আছে। ভুলে গিয়েছি অফ করতে।"

রহস্যময় হাসি হেসে পরিমলবাবু বললেন, "মাধবী খুব সাবধানি। ওভেন ঠিক অফ করেছে। গিয়ে দেখে আয়।"

বন্ধুর কথায় নয়, নিজের আগ্রহে রান্নাঘরে গেলেন বিকাশবাবু। আশ্চর্য ব্যাপার, ওভেন কিন্তু অফ করাই আছে। হয়তো নিজেই করেছেন। ঠিক মনে করে উঠতে পারছেন না।

অবশেষে বিদায়ের সময় এল। একটু আগেই বেরিয়ে পড়লেন বিকাশবাবু। পরিমলবাবু বললেন, "ট্রেনের তো এখনও দেরি আছে। একটু পরে বেরোলে পারতিস। লক্ষ্মণ এসে ব্যাগ বয়ে দিত তোর।"

"যাই, ধীরেসুস্থে। নিজের দিকে খেয়াল রাখিস, ভাল থাকিস," বলে ব্যাগ হাতে বারান্দা থেকে নেমে এলেন বিকাশবাবু। গেট খুলে রাস্তায় চলে গিয়েছেন। দু'-চার পা যাওয়ার পর বন্ধুর দিকে ফিরে হাত নাড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে দেখলেন, অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড! পরিমল দু'টো হাত তুলে বিদায় জানাচ্ছে।

কী করে সম্ভব? পরিমলের একটা হাত প্যারালিসিস, লেপটে থাকে শরীরের সঙ্গে। ওই হাতটা কীভাবে তুলল ও! অবাক বিস্ময়ে বন্ধুর দিকে চেয়ে আছেন বিকাশবাবু, মাধবীর হয়ে বাঁ হাতটা নাড়াচ্ছে পরিমল। নাকি মাধবীই তুলে ধরেছে ওর অকেজো হাত? মাথায় আসছে না কিছুই। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন বিকাশবাবু। উনি জানেন, ওদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে পরিমলবাবুর মতো উনিও মাধবীকে দেখতে পাবেন।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

ললিত ভবন

দুলেন্দ্র ভৌমিক

সদ্য চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার সৈকত সমাদ্দার ভাবছিলেন অবসরের দিনগুলো কোথায় কেমনভাবে কাটাবেন? চাকরি জীবনে দিন কেটেছে একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। একদিনের জন্যও অনিয়ম হয়নি। কখনও-কখনও সীমান্তে গন্ডগোল বাধলে তখন তো আলাদা ব্যাপার। উত্তেজনা, সীমান্ত রক্ষার তদারকি, ম্যাপ খুলে অধস্তনদের সঙ্গে আলোচনা, এই সব করতে-করতেই অনেক বছর কেটে গিয়েছে। এই একঘেয়ে জীবন থেকে যখন মুক্তি মিলল, সৈকত সমাদ্দার ভাবলেন, এবার জীবনটা অন্যরকমভাবে কাটাবেন। কিন্তু সেই 'অন্যরকমটা' কেমন? সেই কথাটা ভাবতে-ভাবতেই একদিন কাগজে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। সেই বিজ্ঞাপনখানা দেখে তিনি স্ত্রীকে বললেন, "জানো, দক্ষিণ বারাসাতের একটা জায়গার নাম 'নাইয়ারচক'। ওই নাইয়ারচকে একটা ভুতুড়েবাড়ি বিক্রি আছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। চলো, একবার গিয়ে বাড়িটা দেখে আসি। পছন্দ হলে কিনে নেব।"

সৈকত সমাদ্দারের স্ত্রী সুনন্দা বললেন, "বাড়ি দেখতে যাওয়ার আগে ভাল করে ভেবে নাও, যদি পছন্দ হয়ে যায় তবে কি সত্যিই কিনবে?"

সৈকত সমাদ্দার উত্তর দিলেন, "কিনলে ক্ষতি কী?"

সুনন্দা চোখ বড়-বড় করে স্বামীর দিকে তাকালেন। পরে বললেন, "ভূতদের সঙ্গে থাকতে পারবে?"

সৈকত সমাদ্দার বললেন, "ভূতটুত সব বাজে ব্যাপার। তা ছাড়া একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ভূতের সঙ্গেই তো আমাদের দিন কাটছে। চেহারা বদলে গিয়েছে বলে চিনতে পারছি না। ওই বাড়িটি এক ধরনের হেরিটেজ বিল্ডিং। ওই সব বাড়িও এক অর্থে বিরল প্রজাতির মতো। কেউ কিনে ফেলার আগেই বাড়িটা আমি কিনে রাখতে চাই।"

সুনন্দা বললেন, "তবে চলো, দেখে আসি।"

অন্য দশজন মহিলার মতো সুনন্দাদেবী আদৌ ভূতে ভীত নন। বরং তাঁর দীর্ঘদিনের শখ, বাঘ-সিংহ, গন্ডার, জলহস্তী ইত্যাদি প্রাণীদের দেখার জন্য যেমন বড়-বড় শহরে পশুশালা আছে, তেমনই যদি প্রত্যেক শহরে একটা করে 'ভূতশালা' থাকত তবে টিকিট কেটে সেই

ভূতদের চাক্ষুষ করে আসা যেত। ভূত নিয়ে নানা ধরনের বানানো গালগল্প শুনতে হত না। এবার নাইয়ারচকের ভূতওলা বাড়িতে গিয়ে যদি খানকয়েক সত্যিকারের ভূত দেখা যায়।

এক রবিবার সকালে একখানা কোয়ালিশ গাড়ি করে ওঁরা রওনা হলেন, সঙ্গে ড্রাইভার হনুমান সিংহ, ভাগ্নে নিতাই আর বাঘা। বাঘা কোনও সূত্রেই সৈকতবাবুর আত্মীয় নয়। কিন্তু ছেলেটি শক্তিধর এবং হরবোলা। যে-কোনও পাখি অথবা জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারে। লাদাখ থেকে ছেলেটিকে সৈকতবাবু এনেছিলেন। সেই থেকে এই বাড়িতেই আছে। ওর বাঘের ডাক শোনবার মতো। একেবারে নিখুঁত। এত নিখুঁত যে, একবার সুন্দরবনে সৈকতবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এমন একখানা ব্যাঘ্রগর্জন গর্জে ছিল যে, উঁচু টঙের উপর দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদার বন্দুক সমেত গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা মাটিতে শুয়ে কেঁপেছিল। সৈকতবাবুর মতে, মানবদেহে এত দীর্ঘস্থায়ী কম্পন দেখা তো দূরের কথা, শোনাও যায়নি। ভাল বাঘের ডাক ডাকতে পারত বলে ওর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'বাঘা'।

সকালে রওনা দিয়ে দুপুর নাগাদ সেই ভূতের বাড়িতে পৌঁছনো গেল। সাদা রঙের বিশাল বাড়ি। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। কালো রঙের লোহার গেটের উপর ছোট্ট একটা টিনের বোর্ডে সতর্কবাণী লেখা। যেমন অনেক বাড়িতে থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান', তেমনই এই বাড়ির গেটে লেখা, 'ভূত হইতে সাবধান'।

গেটের গায়ে একটা নাইলনের দড়ি ঝুলছে। সৈকতবাবু দড়ি ধরে টান দিতেই বাড়ির মধ্যে ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি হল। তার পরেই দীর্ঘ চেহারার এক ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় এসে গেটের দিকে তাকালেন। সৈকতবাবু এবং তাঁর স্ত্রী, এমনকী গাড়ির ড্রাইভার হনুমান সিংহ, ভাগ্নে নিতাই আর বাঘা, সকলেই অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফরসা লোক জীবনে অনেক দেখেছেন, কিন্তু এমন চুনকাম করা ফরসা মানুষ কখনও দেখেননি। শখের নাটকে বিশেষ করে 'মিশরকুমারী' নাটকে মিশরের ফারাও রামেসিসের ঢোলা ওভারকোটের মতো একটা পোশাক।

বারান্দার উপর থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চাই?"

সৈকতবাবু বললেন, "আমরা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আসছি। এই বাড়িটা নাকি...।"

দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। আপনি খদ্দের সেটা বললেই মিটে যায়।" এবার দোতলার একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, "হারু, যা বাবা, গেটটা খুলে দিয়ে আয়। খদ্দের এয়েছে।"

একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে লোহার গেটটা খুলে দিতে-দিতে বলল, "আমার সঙ্গে আসুন।"

দোতলায় উঠে এসে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। হারু নামের ছেলেটি একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "বসুন। স্যার আসছেন।"

বেশ বড় সাইজের একটা ঘর। ঘরের আসবাবপত্র সবই সাবেকি আমলের। ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিল ঘিরে খানপাঁচেক চেয়ার। হারু যেতে-যেতে দরজা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী পান করবেন? চা না শরবত?"

সৈকতবাবু বললেন, "চা।"

হারুর প্রশ্ন, "চিনি ও দুধ সহযোগে, নাকি...।"

হারু কথা শেষ করার আগেই সৈকতবাবু বললেন, "চিনি চলবে, কিন্তু দুধ চলবে না।"

হারু চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পাঁচ কাপ চা টেবিলে এসে গেল। এত তাড়াতাড়ি কে চা করল আর কেই-বা দিয়ে গেল, সেটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত পাঁচজনের কেউই বুঝতে পারলেন না। সম্ভবত সেই কারণেই সকলে সকলের দিকে তাকালেন। শুধু সৈকতবাবুর ভাগ্নে নিতাই বলল, "মামা, এত তাড়াতাড়ি পাঁচ কাপ চা তো জংশন স্টেশনেও বানিয়ে দিতে পারে না!"

সৈকতবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "আমরা এখন কোথায় বসে আছি তা জানিস? স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে, সেটা ভুলিস না।"

একটু পরেই আবার সেই চুনকাম করা দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এলেন। সকলের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। হারু ওই ভদ্রলোকের জন্য একখানা চেয়ার এনে পেতে দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, "বাড়িটা যখন কেনার শখ হয়েছে, তখন উপর-নিচ একটু ঘুরেটুরে দেখবেন না?"

সৈকতবাবু বললেন, "সেসব পরে হবে। আমি আপাতত বায়না করে যেতে চাই। যাতে অন্য কেউ এসে..."

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের বুঝি ভূত দেখবার শখ হয়েছে? হওয়াই স্বাভাবিক। ওরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু অনেক হলে কী হবে, ওদের যে দেখা যায় না! যা আছে অথচ দেখা যায় না তার প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশি।"

সৈকতবাবু বললেন, "আমি কিন্তু বায়না করব বলে কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

ভদ্রলোক বললেন, "তা বেশ করেছেন। তবে না আনলেও চলত। মানুষের কথার নড়চড় হয়, কিন্তু ভূতদের কথার নড়চড় হওয়ার জো নেই। এতেই বোঝা গেল ভূতেদের সঙ্গে আপনার এই প্রথম কাজ-কারবার। তবু আমার পক্ষে যা জানানো প্রয়োজন, সেগুলো জানিয়ে রাখছি।"

সৈকতবাবু এবং অন্যরা আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক বললেন, "এই বাড়িটা তিনতলা। দোতলা আর তিনতলায় মোট আটখানা ঘর। কিন্তু একতলায় অর্থাৎ গ্রাউন্ডফ্লোরে যে পাঁচখানা ঘর আছে সে ঘরগুলো কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না।"

সৈকতবাবু প্রশ্ন করলেন, "কেন? বাড়ি কিনলুম আমি, অথচ একতলার ঘর ব্যবহার করতে পারব না কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "কলকাতা থেকে এতটা পথ ঠেঙিয়ে এসে যখন ভুতুড়েবাড়ি কিনতে চলেছেন, তখন কি একবারও ভাববেন না, গোটা বাড়ির সব ঘর আপনাদের দখলে চলে গেলে ওই বেচারাগুলো চোদ্দো পুরুষের আশ্রয় ছেড়ে যাবে কোথায়? হতে পারে ভূত, কিন্তু তাই বলে কি ওদের প্রতি সমাজের কোনও দায়িত্ব নেই। ভূত কি গাছে ফলে? মানুষ থেকেই তো ভূত। কে বলতে পারে ওদের মধ্যে আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ নেই?"

সৈকতবাবু ভেবে দেখলেন, কথাটা

অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তা ছাড়া ভূতসম্প্রদায় খেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে কিনা, কিংবা ভূত-আন্দোলন, পথ অবরোধ, অর্থাৎ যা যা মানুষ করে, ভূত যদি তাই করতে পারে এবং করতে থাকে, তবে তো ভয়ংকর ব্যাপার। পুলিশ, প্রশাসন আর আইনত তাদের ধরবে না, উলটে তারা এসে ধরবে সৈকতবাবুকে। তবে এটাও তো ঠিক, ভুতুড়েবাড়িতে যদি ভূতই না থাকে তবে আর ভুতুড়েবাড়ি কিনে কী লাভ?

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই সৈকতবাবু ভদ্রলোকের দিকে চোখ ফেরালেন। একটু কেশে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে সৈকতবাবু বললেন, "আপনার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। বেশ, নীচের ঘরগুলো ছেড়ে দেব। ভূতবাবুরা ওখানে থাকুন। এত কাছাকাছি থাকবে, কিন্তু কোনও অনিষ্ট করবে না তো?"

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "কোনও ভয় নেই। বাড়ি বিক্রি হলেও আমি তো পুরো টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত চিলেকোঠাতেই থেকে যাব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষ ছাড়া মানুষের বড় রকমের অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। ভূতের সাধ্য কী যে, পৃথিবীজুড়ে দু'-দু'টো বিশ্বযুদ্ধ বাধায়?"

সৈকতবাবুর স্ত্রী বললেন, "আপনি কত দিন ধরে এই বাড়িতে আছেন? আপনার পরিবারের..."

ভদ্রলোক মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "আমার পরিবারের কেউ নেই। অর্থাৎ কেউ বেঁচে নেই। সকলেই মারা গিয়েছে। এই বাড়িটা আমি তৈরি করেছিলাম। বাড়িটার নাম 'ললিত ভবন'। আমার ছেলেরা নামটা রেখেছিল। ললিতমোহন রায় অনেক কাল আগে গত হয়েছে, কিন্তু আমার ছেলেদের দেওয়া নামটা রয়ে গিয়েছে।"

সৈকতবাবু বড়-বড় চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনার ছেলেদের দেওয়া নাম মানে?"

সেই ভদ্রলোক বললেন, "মানে খুব সোজা। আমার নামই ললিতমোহন রায়। একাত্তর বছর পাঁচ মাস চোদ্দো দিনে আমি মারা যাই। মারা যাই কলকাতার বেনেটোলায়। তারপর ফিরে আসি এই ললিত ভবনে। এখানে যারা থাকে তারা কোনও না-কোনও সূত্রে আমার আত্মীয়, স্নেহভাজন বা জ্ঞাতি। মানুষের মধ্যে একান্নবর্তী প্রথা ভেঙে গেলেও, আমাদের ভূতসমাজে কিন্তু সে প্রথা এখনও লুপ্ত হয়নি। আমরা মিলেমিশে ভালই আছি।"

সুনন্দাদেবী বললেন, "দেখুন, জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, অনেক দেশ, অনেক রকমের মানুষ, অনেক সুন্দর-সুন্দর জিনিস, কিন্তু কখনও ভূত দেখিনি। তাই ভূত দেখবার বড্ড শখ।"

ভদ্রলোক একটু আগে, যিনি নিজেই বললেন, একাত্তর বছর পাঁচ মাস চোদ্দো দিন আগে তিনি মারা গিয়েছেন, সেই ললিত ভূতমহাশয় বললেন, "তা কেন হবে? মনে করে দেখুন, অনেক জিনিসই আপনি এবং আপনারা কখনও দেখেননি। অফিস টাইমে ফাঁকা বনগাঁ লোকাল, মন্দিরে-মন্দিরে জাগ্রত ভগবান, এরকম বহু জিনিস আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না।"

সৈকতবাবু বললেন, "আমরা এখানে হয়তো সারাজীবন থাকব না। এখন গোড়ার দিকে কিছুদিন থাকব। তারপর কলকাতায় চলে যাব। হয়তো মাঝে-মাঝে দু'-তিন দিনের জন্য আসা হবে।"

ললিতবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।"

সৈকতবাবু প্রশ্ন করলেন, "কেন? পারব না কেন?"

ললিতবাবু বললেন, "ইনজেনারেল সব ভূতরাই খুব স্নেহপ্রবণ হয়। মানুষকে খুব ভালবাসে। অথচ নানা সময়ে নিতান্ত অকারণে ভূতদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তাদের কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ঘটানো এবং লম্বা লিকলিকে হাত-পা কল্পনা করে তাদের চেহারাকে বিচিত্রদর্শন করার বদমতলব তো মানুষের মাথা দিয়েই বেরিয়েছে। অথচ কত সুন্দর-সুন্দর চেহারার ভূত আর ভূতিনি অর্থাৎ পেতনিবোনেরা আছে, সে খবর কি মানুষ রাখে?"

সৈকতবাবু বললেন, "তা হলে এখানে ভূতের সন্ধান পাব, কী বলেন?"

ললিতবাবু বললেন, "হায় রে মানুষ। এখনও সন্দেহ গেল না। এই যে আমি আপনার সামনে বসে আছি, এই আমিটা বর্তমানে কে এবং কী? দিন, বায়নার টাকা দিন।"

এবার যেন কুয়াশার মতো একটা পাতলা ভয় ওঁদের পাঁচজনের শরীরকে আস্তে-আস্তে জড়িয়ে ধরেছে। সৈকতবাবু নিজের ব্যাগ থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে বললেন, "বায়নার জন্য দশ হাজার টাকা এনেছি। চলবে তো ললিতবাবু?"

ললিতবাবু "আঃ," বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কত কাল পরে একজন মানুষের কণ্ঠে 'ললিতবাবু' সম্বোধনটা শুনলুম। প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেল। দাঁড়ান, আমি অ্যাডভান্স নেওয়ার রসিদটা নিয়ে আসি।"

এক পলকে উধাও হয়ে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। জামার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করতে-করতে বললেন, "এই সব রসিদ, সইসাবুদ, দলিল, আমাদের সমাজে চলে না। আমরা সব কাজ করি মুখের কথায়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে এবার কারবার করতে নেমে সেই মানুষের নিয়ম অনুসারেই করতে হল। অথচ দেখুন, অত লেখাপড়া, দলিল-দস্তাবেজ সব থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা। মা-ছেলেতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ছিঃ ছিঃ, এরা আবার মানুষ! যাকগে, টাকাটা দিন..."

ললিতবাবু এবার সৈকতবাবুর দিকে হাত বাড়ালেন। আগেই বলেছি মিশরের ফারাও রামেসিসের ঢোলা ওভারকোটের মতো একটা পোশাকে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল। পোশাকের বাইরে ছিল গলা, মুখ আর মাথার ওইটুকু অংশই দেখে মনে হয় চুনকাম করা। এবার ঢোলা পোশাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মেদবর্জিত একটি কঙ্কাল হাত। সেই কঙ্কাল হাতের আঙুলে একটি হিরের আংটি জ্বলজ্বল করছে।

টাকা দিতে গিয়ে সৈকতবাবুর ভিতরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। যদিও ললিতবাবু ইতিপূর্বেই নিজে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি একাত্তর বছর পাঁচ মাস চোদ্দো দিন আগে মারা গিয়েছেন। কিন্তু সেটা কত বছর আগে, সেই হিসেবের চেয়েও জরুরি তথ্য এবং অতি বাস্তব ঘটনা হল, তিনি অর্থাৎ সৈকতবাবু এখন এই মুহূর্তে একটি জ্যান্ত ভূতের সামনে বসে। সেই জ্যান্ত ভূত তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে আছেন বাড়ি বিক্রির অ্যাড্‌ভান্স টাকার জন্য। সৈকতবাবু যেই টাকার বাণ্ডিলটা ওই মেদবর্জিত কঙ্কাল হাতের উপর দিলেন ঠিক তখনই সম্ভবত বিষম ভয়

পেয়ে হনুমান সিংহ একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে প্রথমে ঘরের দরজায়, তার পরেই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে একতলার উঠোনে। সৈকতবাবু অনুমানে বুঝলেন, হনুমান নির্ঘাত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নেমেছে। কেননা, সিঁড়ি ভেঙে এত তাড়াতাড়ি নামা সম্ভব নয়।

সৈকতবাবু দোতলা থেকে ঝুঁকে পড়ে হনুমান সিংহকে দেখতে-দেখতে বললেন, "আমার ড্রাইভারটা মরে গেল নাকি?"

ললিতবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ললিত ভবনে মরা মানুষরাই আসে। এখানে এসে কেউ মরে না। তা ছাড়া একতলায় আমাদের একটা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। ওটা হালদার সামলান।"

সৈকতবাবু একটা ঢোক গিলে বললেন, "এখানে যদি মরা মানুষরাই আসে, তা হলে আমরা এলাম কেমন করে?"

ললিতবাবু বললেন, "মানুষের কাছে যেমন অতিথি আসে, আমাদের কাছেও তেমনই অতিথি আসে। এখানে এসে বসবাস করলে দেখবেন, ভূত সম্পর্কে অনেক ধারণা বদলে গিয়েছে। যেমন হালদারবাবু, সেই কবে থেকে মরব-মরব করছেন, কিন্তু মরণ আর হচ্ছে না। কেন জানেন?"

সৈকতবাবু বললেন, "কেন?"

ললিতবাবু উত্তর দিলেন, "এটা হল ভূত-জোন। বাবা ভোলানাথের দৃষ্টি আছে এই বাড়ির উপর। যমরাজের মৃত্যুদূতের সাধ্য নেই এখানে কারও গায়ে হাত দেয়। বাড়ির মেন গেট অতিক্রম করতে পারবে না। বাড়িতে ঢোকা তো দূরের কথা!"

কথা শেষ করেই ললিতবাবু বললেন, "কলকাতা থেকে বেরিয়েছেন নিশ্চয়ই সকাল-সকাল। যেতেও তো অনেকটা সময় লাগবে। তাই বলি কী, ললিত ভবনে দ্বিপ্রাহরিক আহারটা সেরে গেলে হত না?"

সৈকতবাবুরা সকলেই সকলের দিকে তাকালেন। ভুতুড়েবাড়ি কেনা এক জিনিস, আর ভূতের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করা একেবারে অন্য জিনিস। সৈকতবাবু দেখলেন তাঁর স্ত্রী চোখের ইশারায় তাঁকে ডাকছেন। ডাকছেন মানে, কাছে ডাকছেন। সৈকতবাবু গুটিগুটি পায়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুনন্দাদেবী স্বামীর হাতে চিমটি কেটে তাঁর দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরালেন। চোখের ইঙ্গিতে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার দৌলতে দেশ-বিদেশের কত রান্নাই তো খেয়েছি। কখনও ভূতের রান্না খাইনি। ওদের রেসিপিটা বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে। মিসেস গুপ্তর সাপ্তাহিকে আমি তো 'রান্নাঘর' কলমটা লিখি। ওখানে যদি ভূতের রান্নার রেসিপি লিখতে পারি, তা হলে একেবারে ফাটাফাটি ব্যাপার হয়ে যাবে। তুমি দুপুরে ভূতদের সঙ্গে খেতে রাজি হয়ে যাও।"

সৈকতবাবু ভাবলেন। একটু দোনামোনা করে ললিতবাবুকে বললেন, "আপনার প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমরা আপনার কথামতো দ্বিপ্রাহরিক আহারটা করেই যাব।"

ললিতবাবু খুশি হয়ে বললেন, "এই তো খাঁটি মানুষের কথা। ও রে হারু, আরও পাঁচখানা পাতা পাততে হবে। তবে হ্যাঁ, যে বেচারি গিমিকুমড়োর মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়েছে, তার কারেন্ট কনডিশনটা কেমন, সেটা দেখে পাতা পাতার আয়োজন করো।"

এতক্ষণ পর সকলেই বুঝতে পারলেন, হারুও সম্ভবত মানুষ নয়। সৈকতবাবু নিজের মনেই নিজের ভাবনাটাকে সংশোধন করে নিয়ে মনে-মনে বললেন, 'সম্ভবত' শব্দটা এক্ষেত্রে ব্যবহার করার কোনও সুযোগই নেই। হারু নির্ঘাত ভূত। মৃত্যুর আগে যে নাম থাকে, ভূত হওয়ার পর সেই নামেই ভূত রেজিস্ট্রারে ভূতদের নাম তোলা হয়।'

হারু চলে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ফিরে এল। ফিরে এসেই সে মানুষের মতো কাঁপতে লাগল। সৈকতবাবু লক্ষ করলেন, হারু কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু সে বলতে পারছে না। ভূতদের কি সেরিব্রাল হয়? ওটি হলেই তো কথা জড়িয়ে যায়। হারুভূতের হল কী?

ললিতবাবু এগিয়ে এসে কম্পনরত হারুকে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই হারুর হাড়ে-হাড়ে ধাক্কা লেগে ঠকাঠক শব্দ উঠল। আর তখনই হারু বলে উঠল, "স্যার, বউদি আসছেন।"

ললিতবাবু অস্ফুটে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "কী সর্বনাশ! সে তো তালডাঙায় গিয়েছিল বোনপোর বাড়িতে। আজ তো আসার কথা নয়।"

হারুর সর্বাঙ্গ জুড়ে হাড়ে-হাড়ে ঠোক্কর লেগে হাড়তরঙ্গ বেজে যাচ্ছিল। ওই শব্দ তরঙ্গের মধ্যেই হারু বলল, "আসার কথা নয়, কিন্তু এসে পড়েছেন। আমি এবার যাই।"

হারু এক দৌড়ে যেন পাখির মতো ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। অনুনয়ভরা কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন, "আমাকে একা ফেলে যাস না। একা পেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।"

কৌতূহল চাপতে না পেরে সৈকতবাবু বললেন, "এত ভয় কার জন্যে? কে আপনাকে আস্ত রাখবে না?"

ললিতবাবুর কাতর কণ্ঠের উত্তর, "জগৎ-সংসারে মানুষ টু ভূত, বিড়ালছানা টু হস্তীশাবক সকলেই যাকে ভয় করে।"

সৈকতবাবুর প্রশ্ন, "কিন্তু তিনি কে?"

ললিতবাবু ধুতির কোচা সামলে দৌড় দেওয়ার আগে উত্তর দিলেন, "প্রত্যেকের নিজের স্ত্রী। এই একটা ব্যাপারে ভূত আর মানুষে কোনও পার্থক্য নেই।"

সুনন্দাদেবী ভূতের রান্নার রেসিপিটা জানতে না পেরে বড়ই মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। ললিতবাবু চিলেকোঠায় তরতর করে উঠে যাওয়ার আগে সুনন্দাদেবীকে বলে গেলেন, "সরি ম্যাডাম, পরে যখন আসবেন তখন অনেক রকম ভূত-রান্নার রেসিপি বলব। আজ হাতে সময় সংক্ষেপ। শুধু একটা স্পেশ্যাল ব্রেকফাস্টের কথা বলি, পান্তা ভাত, সঙ্গে মিষ্টি দই আর ভূতের গপ্পো লিখিয়েদের ডান হাতের কব্জির কাবাব।"

আর কোনও কথা বলার সুযোগ কেউ পেল না। নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে একটা দপাদপ আওয়াজ উঠে আসছে। সুনন্দাদেবী তাঁর স্বামীর দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে থামের আড়ালে লুকোও।"

সুনন্দাদেবীর কঠিন গলার এই হুকুম অমান্য করার সাহস ব্রিগেডিয়ার সৈকত সমাদ্দারের ছিল না।

ভূত আর মানুষের এই একটা জায়গায় কী আশ্চর্য মিল!

ছবি: দেবাশিস দেব

বইমেলায় আনন্দ-র ছোটদের বই

প্রচেত গুপ্ত
রুপোর খাঁচা
১৫০.০০

রমা চক্রবর্তী
স্বজনসভায় পশুরাজ সিংহ
৬০.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ডাকাতের ভাইপো
৬০.০০

শৈলেন ঘোষ
গল্পসংগ্রহ
৪০০.০০

সমরেশ মজুমদার
মানুষ পাচার
৮০.০০

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
অদৃশ্য নজরদার
১০০.০০

সুচিত্রা ভট্টাচার্য
ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য
৮০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ
৮০.০০

সুপ্রিয় ঠাকুর
বুদি ৮০.০০

ড. মণি ভৌমিক
বিশ্বজীবনী ১২৫.০০

এই বিশ্বজীবনীর অন্তিম বাণীটি কী? কী বার্তা আমাদের জন্য বিচ্ছুরিত সারা বিশ্বজুড়ে? আকাশ ভরে আমাদের জন্য কোন কথা লেখা আছে তারার অক্ষরে? শিখতে পারি, আমরা যেহেতু সবাই একই উৎস থেকে উৎসারিত, আমাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত সমস্ত বিদ্বেষ।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
দশটি কিশোর উপন্যাস
৩০০.০০

দশটি কিশোর উপন্যাস তো নয়, এ যেন থ্রিলারধর্মী দশটি অভিযান! অভিযানভিত্তিক এই উপন্যাসগুলো লেখকের প্রথম জীবনের সাড়া জাগানো গ্রন্থের একত্র সমাবেশ। এতে আছে দিঘা সৈকতে আতঙ্ক, কাকাহিগড় অভিযান, গিরিগুহার গুপ্তধন, হিন্দোল সর্দারের কেল্লা, অমরকণ্টক রহস্য ইত্যাদি কাহিনিগুলো আরও সুন্দর এবং পরিমার্জিত চেহারায়।

বিমান নাথ
নক্ষত্রের গান
১০০.০০

একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীর লেখা এই বইয়ে এমন কিছু প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে, যার উত্তর অনুসন্ধানে এখনও গবেষণা চলছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে যারা নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করার কথা ভাবছেন, সকলেই এই বইয়ে অনেক নতুন খবর পাবেন। পাবেন নক্ষত্রের জগৎকে আরও কাছ থেকে জানার সুযোগ।

জয়দীপ চক্রবর্তী
নতুন স্কুলে গঙ্গাপদ ৬০.০০

গঙ্গাপদর দুঃখ একটাই, গ্রামের লোক তাকে মোটেও মান্য করে না। সব সম্মান যেন একা যদুমাস্টারেরই পাওনা। তিনি গ্রামে পাঠশালা খুলেছেন। একদিন ফটিকের সঙ্গে আলাপ হল গঙ্গাপদর। ফটিক আর তার লোকজন গঙ্গাপদকে আটকে রাখল জঙ্গলে একটা ঘরের মধ্যে। গঙ্গাপদর বাড়িটাও দখল করে নিল তারা। কে এই ফটিক আর কী তার উদ্দেশ্য, এই নিয়ে ঘটতে লাগল আশ্চর্য সব ঘটনা।

কমিক্স

অ্যার্জে
কঙ্গোয় টিনটিন
৭৫.০০

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
দার্জিলিং জমজমাট
১০০.০০
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

রং লেগেছে গাছে-পাতায়
রং লেগেছে ফুলে
আবির মেখে মিঠিন-বাবাই
ছুটির ইশকুলে।

'দোলের কবিতা' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

আমরা কবিতাটির এই চারটি লাইন লিখে দিয়েছিলাম। তোমাদের আরও আট লাইন কবিতা লিখে পাঠাতে বলা হয়েছিল। তোমরা অনেকেই সুন্দর সুন্দর কবিতা পাঠিয়েছ। তার থেকে আমরা কয়েকটি কবিতা বেছে নিয়েছি।

১

দোল এসেছে, দোল এসেছে
রং লেগেছে তাই,
আবির রঙে মাখামাখি
খেলছে দু'টি ভাই।

লেখাপড়ায় আজকে ছুটি
রঙের মজা ভারী,
দোলের দিনে এই মজাটাই
হয় যে রকমারি।

পূর্ণেন্দু বিশ্বাস
পঞ্চম শ্রেণি
কিশোরনগর শচীন্দ্র শিক্ষা সদন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

২

'হিজিবিজি' নিজের গালে
দোলের ছবি আঁকে,
'তিড়িং' মাথায় আলতা ঢেলে
শুধুই নাচতে থাকে।

রঙিন ফাগুন সবার মনে
খুশির রং ছড়াল,
হায় রে! তখন দৃষ্টিহীনের
মনটা কালোয় কালো।

সুমন রুজ
সপ্তম শ্রেণি
মডার্ন স্কুল
কলকাতা-৭০০ ০১৭

৩

ছোট্ট বাবাই রঙিন আবির
চতুর্দিকে ছুড়ছে,
নানান রঙের আচ্ছাদনে,
জগৎটাকে পুরছে।

রং লেগেছে আকাশে আর
রং লেগেছে মেঘে,
রঙের ছোঁয়ায় উঠছে যেন
নিখিল ভুবন জেগে।

অয়ন চট্টোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি
মহিয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন, হাওড়া

আরও যাদের কবিতা ভাল লেগেছে

সেই স্কুলেতে নেই তো মানা
নেই তো বকাঝকা,
সেইখানেতে কেবল মজা
যেই মেলেছি পাখা।

মিষ্টু-পলাশ ডাকছে দূরে
দিচ্ছে যে হাতছানি,
"আয় না তোরা রং মাখি সব,
হোক না জানাজানি।"

সহেলি মুখোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়
কলকাতা

পড়ার ছুটি, ছোটাছুটির
তাধিন ধিনতা ধেই
রং মেখে আর আবির মেখে
বেরোতে বাধা নেই।
মিলি, ঝিলি, দোলন, শোভন
রং মেলাবে আজ,
পলাশ-ফাগুন রঙে আগুন
এ কী রঙিন সাজ!

চিরন্তন ভট্টাচার্য
চতুর্থ শ্রেণি
বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়
কলকাতা

পড়ার টেবিল, বই-খাতার
সঙ্গে আজ আড়ি,
পিচকিরি আর রঙের বালতি
নিয়েই কাড়াকাড়ি।

রঙের খেলা খেলতে নেমে
ছুটল তারা আগে,
গুরুজনের দু'টি চরণ
ভরিয়ে দিতে ফাগে।

শ্রমণ ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি
পাঠভবন
কলকাতা

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

মার্চ মাসের ২২ তারিখটি 'ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার' হিসেবে পালিত হবে এ বছরও। ভিন গ্রহে যদি জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে কেমন হয়? ১০টি বাক্যে লিখে পাঠাও আমাদের। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু লেখাটি পাঠাবে, ২০ মার্চ তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা এপ্রিল সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা:
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

PARLE

সরস্বতী বন্দনার শাশ্বত উপহার

১৫ জানুয়ারি, ২০০৭। অনুষ্ঠিত হল ষষ্ঠ 'পার্লে সরস্বতী বন্দনা ২০০৭'। অভিনেত্রী জয়া শীল দীপের আলোয় উদ্বোধন করলেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে। প্রধান অতিথি ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

এ আজ নতুন কথা নয়। ২০০২ সাল থেকে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী পুজোর সর্বাঙ্গীণ আয়োজনের জন্য পুরস্কৃত করা হচ্ছে একটি স্কুলকে। সরস্বতী পুজোর পুণ্যলগ্নে আজ প্রতিযোগী স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৫৫০। কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতা যেমন বেলঘরিয়া, মধ্যমগ্রাম, ব্যারাকপুর, সোনারপুর, বারুইপুর এবং শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, হাওড়া, আসানসোল, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বর্ধমান, হুগলি — কে নেই সেখানে! প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ৭৫,০০০ টাকা, দু'টি দ্বিতীয় পুরস্কার, প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার, ৫টি তৃতীয় পুরস্কার, প্রতিটি ২৫,০০০ টাকার এবং ৩০টি সান্ত্বনা পুরস্কার, প্রতিটি ২,৫০০ টাকা করে। প্রাইজমানি খরচ হবে স্কুলের পরিকাঠামো, ল্যাবরেটরি, বই কেনা ইত্যাদিতে। পার্লে গঠন করেছিল 'দ্য পার্লে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স', যাদের কাজই হল স্কুলের পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নতি সাধন।

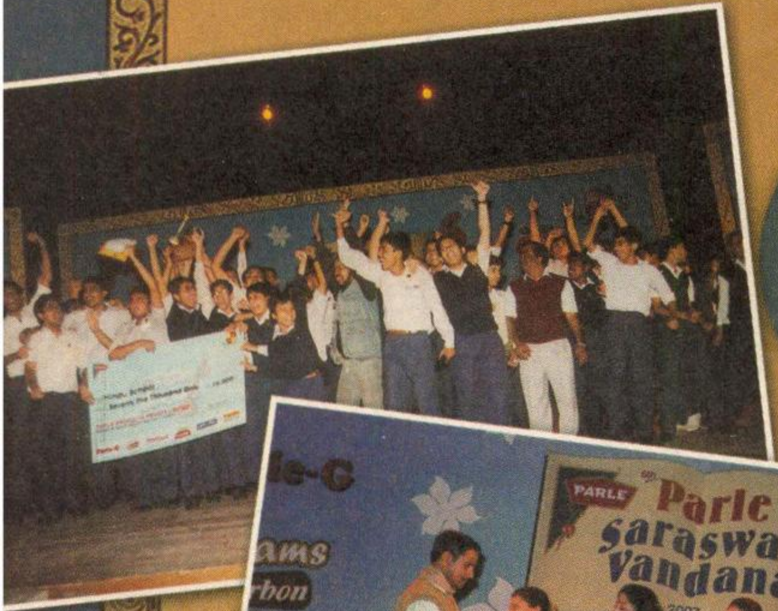

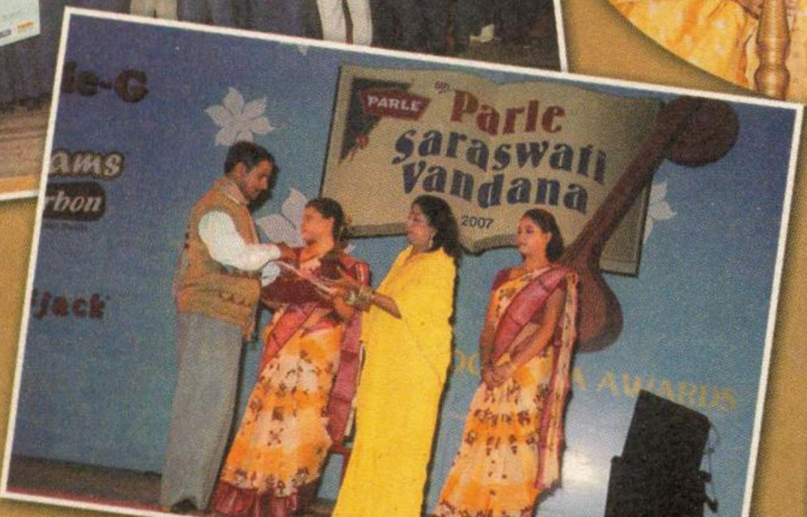

PARLE

কাঁচা আমের জেরক্স
Kaccha
mango bite

ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতাকে উসকে দিয়েছিল উৎসব। নামীদামি বিচারকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে গিয়েছিল তারা। শিলাজিৎ ও শুভমিতার গানের সুরে তাল মিলিয়েছিল সেদিনের সন্ধ্যায়। বিচারকরাও সেদিনের আগে পর্যন্ত ছিলেন খুবই ব্যস্ত। প্রতিটি প্রতিযোগী-স্কুলে গিয়েছিলেন তাঁরা।

পুজো উদ্যোগের খুঁটিনাটি দিকগুলো পরখ করে দেখার জন্য — প্যান্ডেল, প্রতিমা, ভিড়, পরিবেশ, নিয়মানুবর্তিতা, সাজসজ্জা, হাতের কাজ, মনোযোগ এবং সর্বোপরি পার্বণের আবেদন। অভিজ্ঞতার নিক্তিতে মেপে আনা হয়েছিল সেরার নামগুলো।

বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুবোধ সরকার, প্রণতি ঠাকুর, অলকানন্দা রায়, সতীনাথ মুখার্জি।

কিন্তু এত উদ্যোগ নিলেন যাঁরা, নেপথ্যে থাকা পার্লে আসলে কারা? সুপরিচিত ৭৫ বছরের পুরনো কনফেকশনারি কোম্পানিটি বিস্কুট উৎপাদনে অন্যতম। ক্র্যাকজ্যাক, মোনাকো, হাইড অ্যান্ড সিক, মেলোডি, পপিনস্, কাচ্চা ম্যাঙ্গো ইত্যাদি এদেরই অবদান। মুম্বই, নিমরানা (রাজস্থান), বাহাদুরগড়ে এদের কারখানা আছে।

সব শেষে বলি, অন্য ধরনের উদ্যোগে অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে উঠেছিল, বইকি!

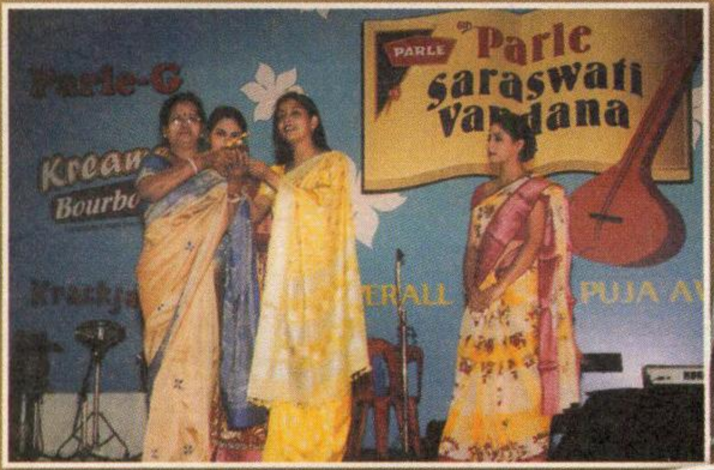

রবিনসন ক্রুসোর ভূত

অমিতাভ পাল

ঘরে ঢুকতেই মেজাজটা গেল বিগড়ে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, "রঞ্জিত।"

কাছেপিঠে কোথাও ছিল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, "দাদা, ডাকছ?"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "এসব কী?" বসার চেয়ারটা যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। উলটো দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চলে গিয়েছে ঘরের এক কোণে। টেবিলটা নিয়েও কেউ টানাহেঁচড়া করেছে। সোজা নেই। জানলার দিকে টেরিয়ে আছে। টেবিলের বইপত্র এলোমেলো। কলমটা আছে কিন্তু ঢাকনাটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয়? রঞ্জিত মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তাই তো, তাই তো..."

"কত দিন না তোকে বলেছি, আমার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক করবি না।"

রঞ্জিত আবার কোনও অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করল, "আমি তো, আমি তো..."

মেজাজটা তো এমনিতেই বিগড়ে ছিল। তার উপরে আগুনে যেন ঘিয়ের ছিটে পড়ল, "তুই করিসনি, তবে কি ভূতে করল?"

সে আর কথা বাড়াল না। ঘরের কাজে মন দিল। বেশিক্ষণ নয়। মিনিট দু'য়েক লাগল ঘরটাকে ঠিকঠাক করতে। তারপর সে ঘাড় নিচু করে চলে গেল।

আমি বুঝতে পারলাম, মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে সে।

মনঃক্ষুণ্ণ সে হতেই পারে। রঞ্জিত এখন আর ঠিক আমার কাজের লোক নয়। যদিও কাজের লোক হিসেবে সে একদিন এসেছিল, এখন ঘরের লোক হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে অনেক দিন আছে। আমাকে 'দাদা' বলে ডাকে।

আমার ঘরের বাইরে একটা বকুল গাছ। গাছে ফুল এসেছে। গন্ধে ম-ম করছে চার দিক। জানলা দিয়ে বকুলের গন্ধ ডাকাতের মতো হানা দিচ্ছে আমার ঘরে।

মফস্‌সল শহর। রাত হয়তো বেশি নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে পাড়াটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে। টেবিলের উপরে ঘাড় গুঁজে জেমস টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ় অফ রাজস্থান' পড়ছি।

ঘরের দরজা আগলে রঞ্জিত। কাজ না থাকলে, আমি যখন পড়াশোনা করি, সে আমার ঘরের চৌকাঠের উপরে চুপ করে বসে থাকে। বেশি রাত হলে, ঢুলতে-

ঢুলতে ঘুমিয়েও পড়ে।

জেমস টডের কলমে জাদু আছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাজস্থানের রানা-মহারানাদের ইতিহাস।

ঢুলতে-ঢুলতে দু' হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে রঞ্জিত। মনে হল, যেন নিজের কানে শুনলাম। কেউ ফিসফিস করে বলে উঠল, "ম্যায় ভুখা হুঁ।"

চিতোর অবরোধ করেছেন আলাউদ্দিন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। প্রথমবারেই মেবারের বেশিরভাগ যোদ্ধা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। যাঁরা বাকি ছিলেন, তাঁরা এবারে দিলেন। বীরশূন্য চিতোর। অসহায় রানা লক্ষ্মণ সিংহ। নিজে এবং নিজের ছেলেরা ছাড়া আর কেউ নেই যুদ্ধে যাওয়ার মতো।

"কে? এ কার কণ্ঠস্বর?"

"আমি, চিতোরের ফুলদেবী।"

"এত খেয়েও তোমার সাধ মেটেনি, মা?"

"তোমার বারোটি পুত্রকে না খাওয়া পর্যন্ত আমার খিদে মিটবে না।"

"কী করতে হবে, মা?"

"প্রতিটি রাজকুমার চিতোরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিন দিন রাজত্ব করবে। চতুর্থ দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করবে। বারোজন রাজকুমার জীবন আহুতি দিলে, তবেই আমার খিদে মিটবে।"

বংশ রক্ষার জন্য রইলেন শুধু রাজপুত্র অজয় সিংহ। বাকি সবাই স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করলেন।

দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির গড়লেন চিতোরের রাজকুমাররা।

ধপ করে একটা শব্দ হল। উঁচু থেকে কেউ কি লাফিয়ে পড়ল মেঝেয়? ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল রঞ্জিত, "কে, কে?"

দুদ্দাড় করে কয়েকটা ভারী বই উপরের র‍্যাক থেকে আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সারি-সারি র‍্যাক। পাল্লাবিহীন র‍্যাকে ঠাসাঠাসি বই। এসব বইয়ের বেশিরভাগ পুরনো। পুরনো বইয়ের দোকান ঘেঁটে বা নিলামে-চড়া কারও ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে আনা।

একেবারে শেষের লটটি এসেছে মাত্র দিন দশেক আগে। শিবপুরের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে।

অবাক হয়ে রঞ্জিত বলল, "কী হল, দাদা?"

"দ্যাখ, হয়তো কোনও হুলো বিড়াল-টিড়াল হবে।"

রঞ্জিত তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। র‍্যাকের সামনে, পিছনে, এমন কী টর্চ জ্বেলে র‍্যাকের তলাতেও। বিড়াল তো দূরের কথা, একটা নেংটি ইঁদুরেরও দেখা মিলল না।

মেঝে থেকে বইগুলো কুড়িয়ে রাখল সে। তারপর আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "দাদা?"

আমি নিজেই আশ্বস্ত হতে পারছি না,

তো তাকে আশ্বস্ত করব কী? তবুও বললাম, "ও কিছু না। অনেক রাত হয়েছে। চল, এবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।"

পরপর তিন দিন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

রাত বাড়ল। পাড়া নিঝুম হয়ে গেল। বকুলের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। আমি ধীরে-ধীরে ডুবে গেলাম ইতিহাসের অতীতে। বাতাসে ফিসফিস করে ভেসে বেড়াল চিতোরের ফুলদেবীর দীর্ঘশ্বাস, "ম্যায় ভুখা হুঁ, ম্যায় ভুখা হুঁ।"

ঠিক তখনই আমাকে কেউ ধাক্কা মেরে ফিরিয়ে আনল অতীত থেকে বর্তমানে। কেউ যেন দুপদাপ করে ঘুরে বেড়াল আমার ঘরের মধ্যে। বইয়ের র‍্যাক হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বেড়াল কিছু। খুঁজে হয়তো পেল না। তাই রাগ করে র‍্যাকের দু'-একটা বই ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেয়।

এই তো গত কাল, সে একটা বই এত জোরে ছুড়ে মারল যে, বইটা গিয়ে লাগল দরজা আটকে বসে থাকা রঞ্জিতের কপালে। সে বেচারার কপাল ফুলে ছোটখাটো একটা আব গজিয়ে গেল। কপালে দু' হাত চেপে রঞ্জিত বলল, "দাদা, আমাকে মারল।"

কার উপরে রাগ করছি, কিছু না বুঝেই আমি রাগে ধমকে উঠলাম, "স্টপ ইট। এসব বন্ধ কর।"

এক ধমকেই স্তব্ধ। সব চুপচাপ। তারপরেই একটা চাপা শব্দ। শব্দটা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের বাতাসে। অনেকটা ফুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে উড়ে বেড়ানো ভোমরার মতো। ঘরের মধ্যে কোথাও কি উড়ছে একটা ভোমরা, নাকি কেউ চাপা স্বরে বিনবিন করে কাঁদছে?

পরের কয়েকটা দিন কাটল ভালভাবে। নতুন করে কোনও উপদ্রব হয়নি। আমি একটু বুক চাপড়ানো গোছের ভঙ্গিতে রঞ্জিতকে বললাম, "সে যে-ই হোক, দেখলি তো, আমার এক ধমকেই চুপ করে গিয়েছে।"

উপদ্রবটা বিদেয় হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে বসলাম পড়ার টেবিলে। গত কাল জেমস টডের বইটা পড়তে-পড়তে পাতায় পেজমার্ক লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম।

কোথায় গেল বইটা? আমি চেঁচিয়ে বললাম, "রঞ্জিত, তোকে না কত দিন বলেছি, আমার টেবিলের বইপত্র সরাবি না?"

সে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমার রাগ চড়ে গেল, "কী রে, জবাব দিচ্ছিস না যে?"

সে ভয়ে-ভয়ে বলল, "আমি তো সরাইনি।"

"সরাসনি মানে, তবে কি বইটা ডানা মেলে উড়ে গেল?"

জেমস টডের বইটা ডানা মেলে উড়ে গিয়েছে কি না জানি না। তবে সত্যি-সত্যি একটা বই উড়ে এসে পড়ল আমার টেবিলে। বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। বইটা যেন কেউ র‍্যাক থেকে টেনে নামিয়ে এনে ধপাস করে রাখল আমার সামনে। ঠিক দেখলাম তো, নাকি চোখের বিভ্রম?

ঝিম মেরে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর হাতের কাছে টেনে নিলাম বইটা। বইটা বেশ পুরনো। পাতা লালচে হয়ে গিয়েছে। হাতে নিয়ে টাইটেল পেজটা উলটে দেখি, ১৭১৯ সালের ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা 'রবিনসন ক্রুসো'। প্রথম সংস্করণের বই।

আমার আগ্রহ মূলত ইতিহাসে। ক্লাসিক লিটারেচারের বইও আছে কিছু। তবে সবই বড়দের। ছোটদের বই তো আমার সংগ্রহে থাকার কথা নয়। আমি একটু অবাক হলাম, "হ্যাঁ রে রঞ্জিত, এ বইটা এল কোত্থেকে?"

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে একটু ধাতস্থ হল সে, "কোত্থেকে আবার? পাঁজা-পাঁজা বই কিনে আনো। কী কিনে আনো, দু' দিন পরে নিজেই ভুলে যাও।"

"আমি কিনে এনেছি? ছোটদের বই আমি কিনব কেন?"

"কেন কিনবে, সে তুমিই ভাল জানো। তোমার যা ভুলো মন। এই তো ক' দিন আগে র‍্যাক থেকে নিজেই টেনে বের করলে একই বইয়ের তিন-তিনটি কপি।"

"বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু আগে চোখে পড়েনি কেন?"

মাথা চুলকে রঞ্জিত বলল, "আগে হয়তো ছিল না, এখন এসেছে।"

রঞ্জিতের কথা শেষ হতে না-হতেই ফরফর করে বইয়ের পাতা ওলটাতে শুরু করল। আমার মাথার মধ্যেও যেন ফরফর করে উড়ছে একটা ফড়িং। কী যে হচ্ছে, বুঝতে পারছি না কিছু।

"রঞ্জিত দ্যাখ, কী অবাক কাণ্ড! বইয়ের পাতা কেমন নিজে থেকেই উলটে যাচ্ছে।"

সে একবার ভাল করে দেখল, "উলটে যাচ্ছে, না হাতি। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। তাই ফরফর করে উড়ছে বাতাসে।"

সে গিয়ে ফ্যানের সুইচটা অফ করে দিল। ফ্যানটা ধীরে-ধীরে থেমে গেল, কিন্তু বইয়ের পাতা আগের মতো উলটে যেতে লাগল।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। কেউ যেন বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছে আপন খেয়ালে। শেষে থামল। যেখানে থামল, সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা নতুন চ্যাপ্টার, 'আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ আ ম্যান'স নেকেড ফুট'।

মেবারের ইতিহাস আমাকে টানছে। সে এক অমোঘ টান দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের। বইটা পড়ার জন্য আমি ছটফট করছি।

আমি খুঁজছি। রঞ্জিতও খুঁজছে। আমার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। সমস্ত বইয়ের র‍্যাক আঁতিপাতি করে খুঁজলাম। প্রতিটি বই সরিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও জেমস টডের বইটা উদ্ধার করতে পারলাম না।

হতাশ হয়ে বসে পড়লাম চেয়ারে। আমার সামনে টেবিলের উপরে রবিনসন ক্রুসো। নিরীহ বইটা যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে। আমি বইটা টেনে নিলাম হাতের কাছে। বইটায় একটা পেজমার্ক লাগানো। আমি পেজমার্কের পাতাটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল, 'আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ এ ম্যান'স নেকেড ফুট'।

এই পেজমার্কটা এখানে এল কী করে? এই তো সেই পেজমার্ক। দু' দিন আগে জেমস টডের বইটা পড়তে-পড়তে উঠে যাওয়ার সময় এই পেজমার্কটাই তো লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম আমি।

পিত্তি জ্বলে গেল আমার। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বইটার উপর। আমি টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিলাম বইটা। বইটা উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেয়। একটা তিরবেঁধা পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে।

রঞ্জিত বলল, "দাদা, মাথা গরম

কোরো না তো! বইটা যাবে কোথায়? আছে কোথাও। আমি কাল দিনের বেলা ঠিক খুঁজে বের করব। তুমি ছাড়া এ-বাড়িতে তো বই পড়ার মতো কেউ নেই।"

আমি অসহায়ভাবে বললাম, "নেই বলছিস?"

রঞ্জিত আর কোনও কথা বাড়াল না। রবিনসন ক্রুসোর বইটা তুলে গুছিয়ে রাখল বইয়ের র‍্যাকে। তারপর চলে গেল কিচেনে আমার জন্য কফি বানাতে। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, মাথা ঠান্ডা করতে এখন আমার চাই এক মগ গরম কফি।

পেজমার্কটা পড়ে আছে মেঝেয়। যেখানে বইটা পড়েছিল, তার চেয়ে একটু তফাতে। বইটা ছুড়ে ফেলার সময় পেজমার্কটা খুলে গিয়েছে।

আমি উঠে গিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিলাম পেজমার্কটা। ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, একটা সার্কাসের টিকিট, 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'। তারিখটা অস্পষ্ট। সালটা কোনওরকমে পড়তে পারি। একান্ন বছর আগের একটা টিকিট।

একান্ন বছর আগে তখন আমিও তো নিতান্ত শিশু। সেই বয়সে আমি কি কোনও সার্কাস দেখেছিলাম? হয়তো দাদু কিংবা বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম কোনও সার্কাস দেখতে। এখন আমার আর মনে নেই।

এত দিন সেই টিকিট কি আমি সযত্নে গুছিয়ে রেখেছিলাম? একান্ন বছর পরে কোনও বইয়ের পেজমার্ক করব বলে, নাকি একান্ন বছর আগে কোনও বইয়ে কেউ পেজমার্কটা লাগিয়েছিল? একান্ন বছর পরে আমি কি তবে ভুল করে খুলে ফেলেছি সেই বই?

প্রশ্নগুলো জট পাকাল আমার মাথার মধ্যে। স্থির কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। ব্যাপারটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হল। দূর অতীতের স্মৃতির মতো জানলা দিয়ে বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি ধীরে-ধীরে হেঁটে গেলাম বইয়ের র‍্যাকের দিকে।

দু'টো বইয়ের মাঝখানে অসহায়ভাবে হেলান দিয়ে আছে রবিনসন ক্রুসো। মিটমিট করে তাকাচ্ছে যেন আমার দিকে। বইয়ের কি প্রাণ আছে? বই কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে?

একান্ন বছরের না-ছোঁয়া অতীত কি এত দিন দমবন্ধ করেছিল দু' মলাটের মধ্যে? সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কার যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উষ্ণ বাতাসের ঝলক এসে লাগল আমার চোখে-মুখে। আমি রবিনসন ক্রুসোর বইটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম অভিভূতের মতো।

রাত বেড়ে গিয়েছে। বিশ্বচরাচর লোপ পেয়ে গিয়েছে আমার সামনে থেকে। নির্জন ঘরে শুধু একলা আমি আর আমার হাতে রবিনসন ক্রুসো।

কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার খেয়াল নেই। আমার কোনও হুঁশ ছিল না। আমার হুঁশ ফেরে রঞ্জিতের ডাকে, "দাদা?"

বইটা আমি সযত্নে তুলে রাখলাম বইয়ের র‍্যাকে। তারপর ফিরে এলাম পড়ার টেবিলে।

রঞ্জিত কখন কফিভর্তি মগ আমার টেবিলে রেখে গিয়েছিল, আমি জানতেও পারিনি। গরম কফি জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে। কফির মগটা তুলে আমি চুমুক দিতে গেলাম। রঞ্জিত বলল, "অনেক রাত হয়েছে। এবার রাতের খাবার খেতে চলো।"

শিবপুর ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে একটা গলির মধ্যে বাড়িটা। লাল রঙের ইট বের করা পুরনো আমলের বাড়ি।

দরজায় কড়া নাড়তেই ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুললেন। নমস্কার করতেই ভদ্রলোক বললেন, "আপনি?"

"কয়েক দিন আগে আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে কিছু বই আমি কিনে নিয়ে গিয়েছি।"

আমাকে চিনতে পেরে ভদ্রলোক বললেন, "আসুন।"

আমরা গিয়ে বসলাম বাড়ির ড্রয়িংরুমে। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "বলুন, কী ব্যাপার?"

আমি সরাসরি কাজের কথায় এলাম, "আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহটা আসলে কার?"

"আমার দাদুর। দাদু ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সাহিত্য ছাড়াও নানা ধরনের বই সংগ্রহের নেশা ছিল তাঁর। নিজে পড়তেন এবং আমাদের পড়তে উৎসাহ দিতেন।"

"আপনাদের বোধ হয় খুব একটা উৎসাহিত করতে পারেননি।"

ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন, "কেন বলুন তো?"

"বাড়িতে উৎসাহী পাঠক থাকলে দাদুর এমন মূল্যবান সংগ্রহ জলের দরে আপনারা কি বেচে দিতে পারতেন?"

"আমার বাবা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। বাবাও খুব পড়তেন। তবে সাহিত্য নয়, আইনের বই।"

"আর আপনি?"

"আমি ব্যাঙ্কে কাজ করি। একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ধর্মতলা শাখার ম্যানেজার। টাকাপয়সার হিসেবনিকেশ যতটা বুঝি, সাহিত্য-টাহিত্য ততটা বুঝি না। আগ্রহও ছিল না কোনও দিন।"

"আপনার দাদু কি বড়দের সঙ্গে-সঙ্গে ছোটদের বইও পড়তেন?"

"কেন বলুন তো?"

"ওই সংগ্রহের মধ্যে ড্যানিয়েল ডিফোর এক কপি রবিনসন ক্রুসো আছে।"

ভদ্রলোক চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "থাকতে পারে। তবে বইটা হয়তো দাদুর নয়, আমার দাদার।"

"আপনার দাদা আছেন নাকি?"

"আছেন নয়, ছিলেন। সে তো আজ থেকে পঞ্চাশ-একান্ন বছর আগের কথা।"

"দাদাকে আপনার মনে পড়ে?"

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। তারপর উঠে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন। হাতে একটা পুরনো দিনের পারিবারিক অ্যালবাম।

কোলের উপর রেখে ঝুঁকে পড়ে নিজেই অ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগলেন। ওলটাতে-ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামলেন। একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর অ্যালবামটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমি ভাল করে দেখলাম। দশ-এগারো বছরের একটি ছেলের ফোটো। বহু দিনের পুরনো। তাই লালচে ও ঝাপসা হয়ে এসেছে। তবুও তার চোখ দু'টি আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুষ্টুমিতে ভরা সেই চোখ।

ফোটোর নীচে ছোট্ট করে লেখা ক্যাপশন, 'এগারো বছরের জন্মদিনে

টুবলু'।

অ্যালবামটা হাত বাড়িয়ে নিতে-নিতে ভদ্রলোক বললেন, "এই ফোটোটা দেখলে তবেই শুধু আবছাভাবে মনে পড়ে। দাদা যখন মারা যায়, তখন আমার বয়স মাত্র তিন।"

"মৃত্যুটা কীভাবে হয়েছিল?"

"শুনেছি, দাদা খুব দুরন্ত ছিল। হয়তো বইয়ের র‍্যাকে চড়তে গিয়েছিল। বইসুদ্ধ ভারী র‍্যাক ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, আর তাতেই সে মারা গেল। তারপর দাদুও আর বেশি দিন বাঁচেননি।"

ঠিক সন্ধের মুখে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। রঞ্জিতকে বললাম, "আমার পড়ার টেবিলের সামনে আর-একটা চেয়ার লাগাতে এবং দু' মগ কফি বানাতে।"

সে একটু অবাক হল। তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে, "দু' মগ কফি?"

আমি তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। হাত-মুখ ধুয়ে ঢুকলাম আমার পড়ার ঘরে।

আজ আর কারও জন্য অপেক্ষা করলাম না। বইয়ের র‍্যাক থেকে নিজের হাতে রবিনসন ক্রুসো বইটা নিয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসলাম।

টেবিলের ওপারে একটা শূন্য চেয়ার। ঠিক আমার মুখোমুখি। চেয়ারটা আগে ছিল না। অন্য ঘর থেকে এনে রঞ্জিত লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

বইটা হাতে নিয়ে আমি তাকিয়ে থাকলাম শূন্য চেয়ারটার দিকে।

একটু পরেই মনের মধ্যে খসখস আওয়াজ। চেয়ারটা নড়ে উঠল। ধপাস করে একটা শব্দ। আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই, কিন্তু বুঝতে পারছি। কেউ যেন এসে বসল খালি চেয়ারটায়, ঠিক আমার মুখোমুখি।

আমি বইটা খুলে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই পড়তে শুরু করলাম, 'আই ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার ১৬৩২।'

বইটা ছিটকে সরে গেল আমার হাত থেকে। ঘুরে গেল খালি চেয়ারটার দিকে। ফরফর করে পাতা ওলটাতে শুরু করল। থামল সেই, আই ফাউন্ড দ্য প্রিন্ট অফ এ ম্যান'স নেকেড ফুট-এ।

বইটা আবার চলে এসেছে আমার হাতের নাগালে। আমি বুঝতে পারলাম, এখান থেকেই শুরু করতে হবে। শুরু করতে যাচ্ছি, রঞ্জিত এসে ঢুকল। তার দু' হাতে দু' মগ কফি। মগ দু'টো নামিয়ে রাখল আমার টেবিলের উপর। গরম কফি। ধোঁয়া উঠছে। কফির সুঘ্রাণে চনমনে হয়ে উঠল ঘরের বাতাস। আমি রঞ্জিতকে বললাম, "এখন তুই কী করবি?"

"আমিও তোমার গল্প শুনব।"

"কিন্তু আমি তো বইটার মাঝখান থেকে পড়তে শুরু করব।"

"এখন মাঝখান থেকে শুনি। পরে না হয় তুমি আমাকে গল্পের গোড়ার দিকটা মুখে-মুখে শুনিয়ে দিও।"

"বেশ, তবে শোন।"

কফিতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আমি পড়তে শুরু করলাম। আমি নিজে পড়ি, সঙ্গে-সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করে শোনাই, "সমুদ্রের ধারে নৌকোটা নোঙর করা আছে। বেলা দুপুর। আমি হেঁটে যাচ্ছি সেই দিকে। নির্জন সমুদ্র সৈকত। সহসা আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নরম বালির উপরে কীসের যেন ছাপ। একজন মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন..."

রাত গড়িয়েছে গভীর রাতের দিকে। কোনও দিকে আমার খেয়াল ছিল না। গল্প তার অমোঘ টানে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। এক সময় গল্পটা শেষ হল।

আগে খেয়াল করিনি। এখন করলাম। বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় গল্পটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার নীচেই কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, 'টুবলু'।

আটান্ন বছর বয়সে ড্যানিয়েল ডিফো লিখেছিলেন রবিনসন ক্রুসোর গল্প। প্রায় পৌনে তিনশো বছর ধরে সেই গল্প আকৃষ্ট করেছে সারা পৃথিবীর অসংখ্য ছেলেমেয়েকে। মুগ্ধ করে রেখেছে তাদের।

এমন যে গল্প, তার অর্ধেকটা সে শুনেছিল দাদুর মুখে। বাকি অর্ধেকটা শোনার জন্য টুবলু যে একান্ন বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকবে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

রঞ্জিত বলে উঠল, "দারুণ!"

আমি তার দিকে ঘুরে তাকাতে গিয়েও ফিরে তাকালাম শূন্য চেয়ারটার দিকে। তাজা বকুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে। চেয়ারটা নড়ে উঠল। কেউ কি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল?

মেঝেয় খসখস শব্দ। শব্দ কি হেঁটে যায়? ক্ষীণ হতে-হতে রঞ্জিতকে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজা দিয়ে শব্দটা বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি বইটা এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। নজর পড়ল কফির মগের দিকে। একটুও তলানি পড়ে নেই। দু'টি কফির মগই বেমালুম খালি।

পরের দিন। বকুল গাছটা গন্ধ ছড়াতে শুরু করতেই আমি এসে বসলাম পড়ার টেবিলে।

কোথায় ছিল? কে রাখল বইটা? আমার পড়ার টেবিলে ফিরে এসেছে জেমস টডের, 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান'।

বইটা পড়তে-পড়তে যেখানে ছেড়েছিলাম, পেজমার্ক লাগিয়ে উঠে গিয়েছিলাম, সেই পেজমার্কটা আজও আছে সেখানেই।

আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি পেজমার্কটার দিকে। সেই পেজমার্ক, একান্ন বছর আগের একটি সার্কাসের টিকিট।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আনন্দমেলা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান: ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
২। প্রকাশকাল: মাসিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বিজিৎ কুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
৪। সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: এবিপি (প্রা) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা: এ সরকার, এ সরকার, এস সরকার, নাবালক পুত্র এ সরকারের পক্ষে এ সরকার, সরকার প্রপার্টিজ (প্রা) লিমিটেড, এবং সরকার কনসালটেন্ট (প্রা) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

আমি বিজিৎ কুমার বসু এতদ্বারা ঘোষাণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ ২০০৭

বিজিৎ কুমার বসু
প্রকাশক

স্লিপি হলোর জঙ্গল

পিনাকী ঘোষ

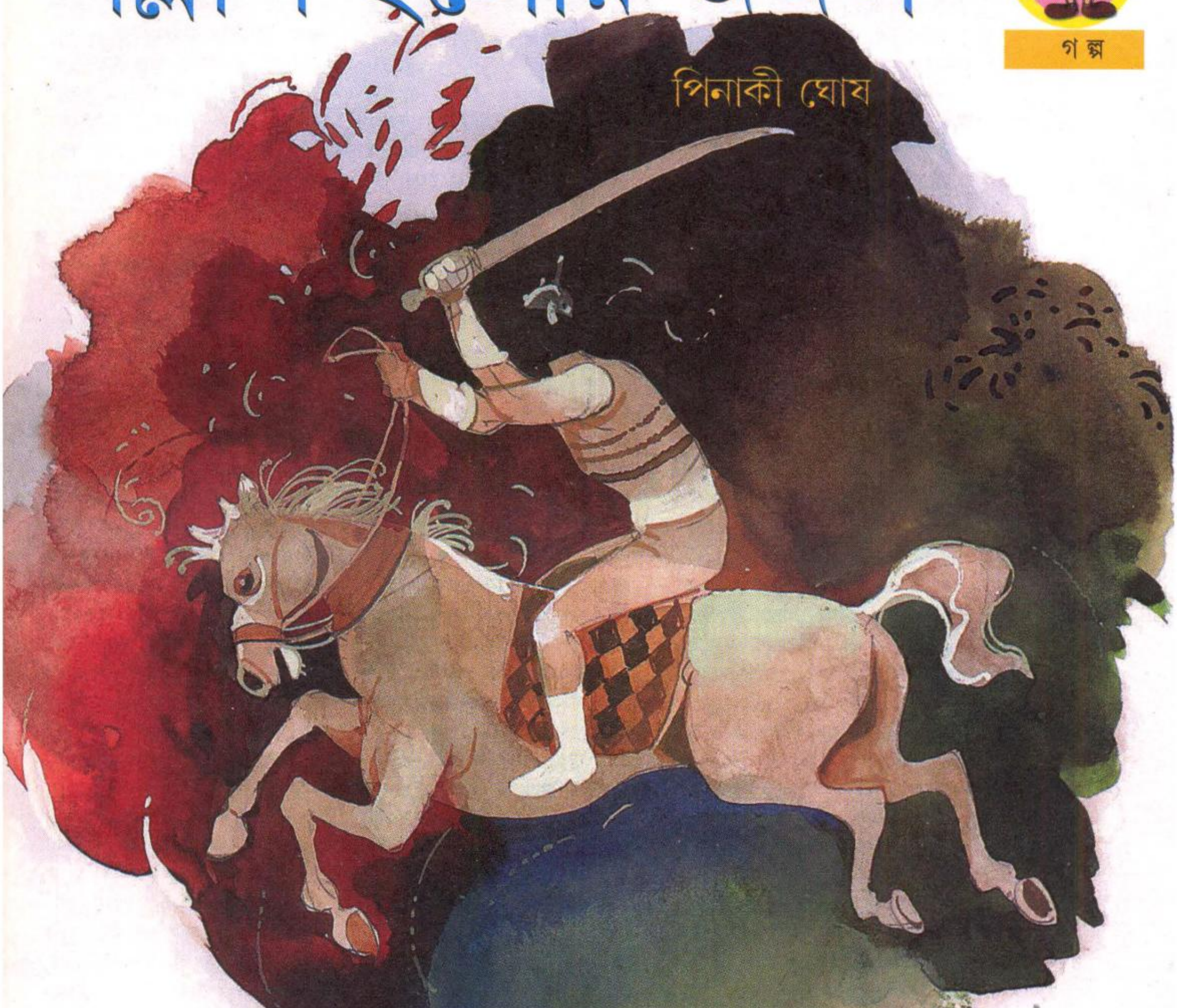

মার্কোস ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু বলবে?" ছেলেটি মার্কোসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "না স্যার।"

"তা হলে... ধন্যবাদ এবং গুডবাই।" বলে রুমসার্ভিসের ছেলেটির মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল মার্কোস।

"গুড ডে স্যার।"

"গুড ডে," হুঁ... আশা করে দাঁড়িয়ে আছে যে, ট্রাঙ্কটা ঘর অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি দশ ডলার টিপ্‌স দেব। হোটেল থেকে যেন এই কাজের জন্য মাইনে দেওয়া হয় না! মেজাজটা ঠিক করার জন্য পরদা দু'টো দু' দিকে সরিয়ে দিতেই ঘরটা ঝলমল করে উঠল।

বাফেলো, নিউ ইয়র্ক। এখানে এক দিন বিশ্রাম নিয়েই মার্কোস রওনা দেবে তার দেশের দিকে, মেক্সিকো। বিমানে

যাওয়ার অসুবিধে আছে। তাই যেতে হবে কিছুটা সড়কপথে, কিছুটা জলপথে।

মিনিট সাতেক ধরে সমস্ত চাবি দিয়ে ট্রাঙ্কটা খোলার জন্য ধস্তাধস্তি করার পর সে নিশ্চিত হল, ট্রাঙ্কের চাবিটা হারিয়েছে। হোটেল থেকে চাবিওয়ালা চাওয়া মানেই একশো ডলার গচ্চা। সেই রুমসার্ভিসের ছোকরাটিকে ডেকে নিলে কেমন হয়?

ছেলেটি নির্ঘাত ম্যাজিক জানে। একটা জেম্স ক্লিপ বেঁকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে ট্রাঙ্কের তালাটা ঠিক তিন মিনিটের মাথায় খুলে দিল, তাতে মার্কোস সুর নরম না করে পারল না।

"বাঃ। তুমি তো ম্যাজিক জানো দেখছি। ভারতীয়?"

"হ্যাঁ," জবাব দিল স্যাম। আসল নাম সম্বরণ বা স্যামব্যার‍্যান। তার থেকে ছোট করে 'স্যাম'।

মার্কোস ওয়ালেট থেকে দু'টো দশ ডলারের নোট বের করে আবার একটা ওয়ালেটেই ঢুকিয়ে স্যামের হাতে একটা গুঁজে দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ।"

ভারতীয় হাউসকিপার ছেলেটি ট্রাঙ্ক থেকে বেরনো বড়সড় ঘোড়ার মূর্তিটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মার্কোস মনে-মনে বলল, কৌতূহলের জন্যই বিড়াল মরে। মুখে বলল, "কিউরিও... পুরনো জিনিস কেনাবেচা করা আমার কাজ। মেক্সিকোতে আমার কিউরিওর ব্যবসা।"

এই ব্যবসার জন্যই তাকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয় ভাল জিনিসের খোঁজে। পুরনো শৌখিন জিনিস, ছবি, মূর্তি অবাক করা দামে বিক্রি হয়ে যায়। এর মধ্যে কিছু-কিছু আবার চোরাই জিনিসও থাকে। হয়তো কয়েক বছর আগে কোনও মিউজিয়াম থেকে চুরি গিয়েছিল। বিক্রি হয়ে গেল মেক্সিকোতে, মার্কোসের হাত দিয়ে। এই জন্যেই সব কিছু সোজা পথে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু সেসব কথা তো আর এই ভারতীয় ছোকরাটিকে বলা যায় না।

অবাক হওয়া চাউনি নিয়েই বিদায় নিল ছেলেটি। সন্ধেবেলায় বৃষ্টি নামল। কাচের জানলা দিয়ে দূর দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। সারি-সারি বহুতল বাড়ির ব্লকগুলো ভিজছে। অনেক নীচে চকচকে কালো সাপের মতো রাস্তা দিয়ে ভিজতে-ভিজতে চলা গাড়ির মিছিল। ঘরের আলোগুলো কাঁপছে। মাঝে-মাঝে ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে, আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। আলোগুলোর এই অদ্ভুত কাণ্ডে অবাক মার্কোস। তড়িঘড়ি ফোন তুলে রুমসার্ভিসকে ডাকল।

ঘোড়ার মূর্তিটির দিকে এতক্ষণ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকানোর অবকাশ হয়েছে মার্কোসের। দুপুরে পোশাক না পালটেই ঘুম, তারপর বিকেলে হট শাওয়ার নিয়ে এখন একটু নীচে রেস্তরাঁয় যাওয়ার কথা ভাবতেই আলোগুলোর এই অদ্ভুত আচরণ। অন্তত শ'দেড়েক বছর বয়স হবে ঘোড়াটির। কোনও এক নাম না-জানা ওলন্দাজ শিল্পীর হাতের কাজ। ওলন্দাজরা যখন নেদারল্যান্ড্স থেকে আমেরিকায় এসে বসবাস করা শুরু করল, সেই সময়কার জিনিস... বলেছেন সেই ওলন্দাজ বৃদ্ধ, যাঁর কাছ থেকে মার্কোস এটা কিনেছে। ব্ল্যাক স্ট্যালোন। অসাধারণ হাতের কাজ। পেশিগুলো যেন জীবন্ত। এটা বেচে কয়েক হাজার ডলার লাভ থাকবে বলে মার্কোসের আশা।

দরজায় ঘন্টির শব্দ। রুমসার্ভিস।

"গুড ইভনিং স্যার। মে আই হেল্প ইউ?" সেই ভারতীয় ছেলেটি।

"ভিতরে এসো। কী আরম্ভ হয়েছে দ্যাখো আমার ঘরে। আলোগুলো কেমন কাঁপছে দেখেছ?"

"ওটা ঠিক হয়ে যাবে স্যার। গোটা হোটেলের অনেক ঘরেই এটা হচ্ছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ওটা মেরামতের জন্য কাজ করছেন।"

"আশা করি দেরি হবে না?"

"না স্যার। মূর্তিটি অনেক পুরনো স্যার?"

"ও... ওটা? হ্যাঁ... দেড়শো তো হবেই।"

"উঁহু। ওটা আরও পুরনো। দু'শো সাত বছর।" বলল স্যাম।

"মানে? তুমি এই মূর্তিটির সঠিক বয়স জানো?" মার্কোসের হাতের লাইটারটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে থেমে গেল।

"আরও অনেক কিছুই জানি। দুপুরে প্রথমবার দেখেই আমি চমকে গিয়েছিলাম। ওটার ছবি আমি একটা ওয়েবসাইটে দেখেছি। ঠিক এই মূর্তিটিই। ওটার সম্পর্কে পড়েওছি ওয়েবসাইট থেকে।"

"তাই নাকি? ফোটো দেখেছ? কোন ওয়েবসাইটে?"

"ফোটো নয়, স্কেচ। ওয়েবসাইটটি ছিল সম্ভবত ট্রুহ্যালুইন ডট কম।"

"হ্যালুইন? মানে... তার মানে তো ভুতুড়ে ব্যাপারস্যাপার। এতে আবার ভুতুড়ে ব্যাপার কোথায়?" মার্কোসের হাতে ধরা সিগারেটটি কেঁপে গেল। ঘরের আলোটা কমে এল। দূরে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা গেল।

দু' জন স্থির চোখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে। কারও চোখের পলক পড়ছে না। তারপর স্যাম শুরু করল, "এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। হাডসন নদীর তীরে। স্লিপি হলো।"

"দাঁড়াও... নামটা শোনা লাগছে," বলল মার্কোস।

"এই নামে একটা সিনেমাও আছে। সেই জন্যেই শোনা লাগছে। গ্রামটি জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গলের নাম 'উড্স অফ স্লিপি হলো'। এতই শান্ত যে, মনে হয় সব সময়ই গোটা গ্রামটি ঘুমোচ্ছে। এই শান্ত গ্রামে ১৭৯৯ সালে শুরু হল অদ্ভুত এক ব্যাপার। গ্রামের রাস্তায় এক-এক করে নিরীহ গ্রামবাসীদের মুন্ডুহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। দেহটা আছে... মুন্ডুটি নেই।"

মার্কোসের হাতে ছ্যাঁকা লাগল। সিগারেটটি শেষ হয়ে গিয়েছে। সিগারেটের বাক্স থেকে আর-একটা বের করে স্যামের দিকে এগিয়ে দিল মার্কোস।

"ধন্যবাদ।"

"কফি? কফি আনাই?" বলে ফোন তুলে দু'টো কফির কথা বলল মার্কোস।

"ধন্যবাদ। অবস্থা এমন হল যে, সন্ধের পর গ্রামবাসীরা জঙ্গলের দিকে তো নয়ই, এমনকী গ্রামের পথে বেরনোও বন্ধ করে দিল। যারা জানলা ফাঁক করে দেখার সাহস করেছিল, তারা বলল, এক বর্মপরা ঘোড়সওয়ারকে গ্রামের পথ দিয়ে সন্ধেরাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দুরন্ত বেগে চলে যেতে দেখেছে। তার চলার পথে যে পড়ে, তলোয়ারের এক কোপে তার মুন্ডু কেটে, মুন্ডুটা নিয়ে চলে যায় সেই ঘোড়সওয়ার। তারা এও দেখেছে যে, বর্মপরা ঘোড়সওয়ারের নিজেরই মুন্ডু নেই। মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার!

গল্প

শহর থেকে তদন্তে এলেন পুলিশ অফিসার ইশাবড ক্রেন। তিনি তদন্ত করে বের করলেন যে, কুড়ি বছর আগে, ১৭৭৯ সালে এক আমেরিকান সৈনিকের যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছিল স্লিপি হলোর কাছেই। শত্রুরা তার মুন্ডু কেটে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে উঠে আসে প্রায়ই তার নিজের মুন্ডুর খোঁজে। সঙ্গে তার ঘোড়া। ঘোড়াটার নাম 'ডেয়ারডেভিল'।"

গ্যাঁ-অ্যাঁ-ক করে ডোরবেলের বিকট শব্দে আর-এক দফা কেঁপে উঠল মার্কোস। কফি এসেছে। জানলার কাচ বেয়ে-বেয়ে নামছে জলের ধারা। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে কেঁপে-কেঁপে উঠছে জানলার শার্সি।

"ইন্টারেস্টিং গল্প। তারপর কী হল?" কফিতে চুমুক দিতে-দিতে বলল মার্কোস গ্যাব্রিয়েল লোনোভেজ়।

"অফিসার ইশাবড স্লিপি হলো গ্রামের ডানপিটে মেয়ে ক্যাটরিনার সাহায্যে খুঁজে বের করলেন স্লিপি হলোর জঙ্গলের সেই গাছ, যার ভিতর থেকে প্রতি রাতে বেরিয়ে আসত মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার। গ্রামের পথে খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মস্ত লাফ মেরে সেই গাছের ভিতরেই ফের ঢুকে যেত সে। শেষে নিজের মুন্ডু খুঁজে পেল সে। পেল গ্রামে ডাইনি বলে চিহ্নিত ক্যাটরিনার সৎমা'র কাছ থেকে। ক্যাটরিনার সৎমাকে হত্যা করে নিজের মুন্ডু ফিরে পাওয়ার পর শেষ হল স্লিপি হলোর মুন্ডুহীন প্রেতের প্রবাদ। ওই গ্রামেই বাস ছিল লেখক ওয়াশিংটন আরভিং-এর। তিনিই এই পুরো ঘটনাবলি উপন্যাস আকারে বের করেন, 'দ্য লেজেন্ড অফ স্লিপি হলো' নামে। পরে এই নিয়ে সিনেমাও হয়।"

"বেশ গল্প! এই মূর্তির সঙ্গে গল্পের সম্পর্ক কী?"

"গল্প এখানেই শেষ হয়ে গেলেও তার পরেও অনেক কিছু ঘটে, যা অনেকেই জানেন না," বলল স্যাম।

ঝপ করে আলোটা এই সময় নিভে গেল। "ওঃ, এবার পুরোপুরিই গেল দেখছি।" বিরক্তি প্রকাশ করল মার্কোস।

"আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন স্যার। এক্ষুনিই বিদ্যুৎ ফিরে পাবেন। যা বলছিলাম... সেই ভয়ানক দেখতে গাছটা এর পর গ্রামবাসীরা কাটিয়ে ফেলে। কাটার সময় অবাক করা রক্তধারায় ভেসে যায় গাছটার আশপাশ। এর এক মাসের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে মারা যায় পিটার ভ্যান গ্যারেট, সেই কাঠুরিয়া, যাকে দিয়ে গ্রামবাসীরা গাছটা কাটিয়ে ফেলে। কীভাবে মারা যায় শুনবেন? মাথায় বজ্রাঘাতে। বাজ পড়ে মাথাটাই উড়ে গিয়েছিল। অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি সেটার। গ্রামে থাকত এক নাস্তিক শিল্পী, বাল্টাস ভ্যান ট্যাসেল। তিনি ঘোড়ার গাড়ি করে গাছটা নিয়ে যান নিজের বাড়ি, খোদাই করে তৈরি করেন এই ঘোড়ার মূর্তি। উপহার দেন সেই পুলিশ অফিসার ইশাবড ক্রেন ও তাঁর নতুন বউ ক্যাটরিনাকে। ইশাবড ও ক্যাটরিনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে জঙ্গলেই মৃত্যু হয় শিল্পী বাল্টাসের। ডাকাতের দল ছিনতাই করে তার মুন্ডুটি কেটে দিয়ে চলে যায়। ১৭৯৯ সাল সেটা। সেই বছরই ক্রিসমাসের ঠিক আগে ঘটে যায় আর-একটি মর্মান্তিক ঘটনা। স্লিপি হলোর পাশেই ট্যারি টাউনে ব্যাঙ্কডাকাতদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে মাথায় গুলি লেগে মারা যান তিরিশ বছরের সাহসী অফিসার ইশাবড। গুলিটি তাঁর মাথাটাই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল তরমুজের মতো।"

বিকট শব্দে খুব কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। এই হোটেলের ছাদেই কি? কাচের শার্সি এবং আসবাব থরথর করে কেঁপে উঠল। মার্কোসও কি একটু কেঁপে উঠল?

"ক্যাটরিনা এর পর মূর্তিটি নিজের কাছে রাখতে চাননি। স্লিপি হলোর প্রবীণ, অভিজ্ঞ মানুষরা ক্যাটরিনাকে পরামর্শ দেন, অভিশপ্ত মূর্তিটি স্লিপি হলোর জঙ্গলের জলাভূমিতে ফেলে দিয়ে আসতে। ক্যাটরিনা মূর্তিটি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকেন, কিন্তু তারপর থেকে গ্রামবাসীরা আর তাঁকেও দেখেনি, মূর্তিটিকেও না।"

অনেকক্ষণ দু' জনেই চুপ করে বসে রইল। "অদ্ভুত গল্প," অনেকক্ষণ পরে বলল মার্কোস।

ঘুমটা হঠাৎ করে ভেঙে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মার্কোস কে জানে? ক'টা বাজে? মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। টিভিটা নিঃশব্দে চলছে, আর তার রঙিন আলোয় ঘরটা মুহুর্মুহু রং পালটাচ্ছে। টিভি দেখতে-দেখতে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ওটা কী? দেওয়ালে ঘোড়ার ছায়া কেন? ছায়াটা কাঁপছে! মার্কোসের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েই নিজের বোকামিতে লজ্জা পেয়ে গেল সে। টিভির আলোয় দেওয়ালে মূর্তিটার ছায়া পড়েছে। মূর্তিটা নিয়ে ভাবতে না চাইলেও অদ্ভুত সব চিন্তা তার মাথায় জট পাকাচ্ছে।

মূর্তিটা কি আজও অভিশপ্ত? গল্পটা কি আদৌ সত্যি? বৃষ্টি থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বাথরুম থেকে একটা টপটপ করে জল পড়ার শব্দ আসছে। কলটা বন্ধ করে এসেছিল না সে? নাকি... ঠিক মনে পড়ছে না। বাথরুমের দরজায় এসে একটু থমকাল মার্কোস।

"এনিওয়ান দেয়ার?" বলে সন্তর্পণে বাথরুমে ঢুকল। লাইটটা জ্বালাল। কেউ নেই। কেন এমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে, যেন কেউ আশপাশেই আছে? কলটা বন্ধ করে বেরিয়ে এল সে।

টেনশন তাড়ানোর ভাল দাওয়াই সিগারেট। মার্কোস ঠোঁটে একটা সিগারেট রেখে লাইটার জ্বালাল। তারপরেই লাইটারটা ফেলে দিয়ে ছিটকে দু' হাত সরে এল। সিগারেটটাও মুখ থেকে পড়ে গিয়েছে। "জিসেস!" বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

মার্কোসের শৌখিন কিউরিও কালেকশনের অন্যতম লাইটারটা। ধাতু এবং কাচ দিয়ে তৈরি জলকন্যা। গত তিন বছর ধরে তার সঙ্গী।

লাইটারটার মাথাটা আর নেই। কাচের জলপরির মুন্ডুটা ভাঙা!

ভিতরে-ভিতরে অদ্ভুত একটা কাঁপুনি অনুভব করছে মার্কোস। লাইটারটা সোফা থেকে পড়ে গিয়েছিল কি? নাকি কেউ মুন্ডুটা...

ঘোড়ার মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়াল মার্কোস। স্লিপি হলোর মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার যে গাছে আশ্রয় নিত, সেই গাছ কেটে তৈরি এই মূর্তি। মার্কোস অনুভব করছে এই ঘরে সে একা নেই। কেন এমন মনে হচ্ছে, সে জানে না... কিন্তু এমনটাই মনে হচ্ছে।

এর পর মার্কোস যা দেখল, তাতে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল, পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল... আর শিড়দাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত ধীরে-ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

কাঠের ঘোড়ার গায়ে তাজা রক্তের ধারা! মার্কোস জ্ঞান হারাল। দড়াম করে তার ছ' ফুট দেহটা লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের উপর।

পরদিন বিকেল পাঁচটা। মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় সন্ধে নামবে। ঘন জঙ্গলে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে বসে ছিল মার্কোস। কুয়াশা বাড়ছে। কুয়াশায় ঢেকে গিয়ে জঙ্গলটা আরও ভুতুড়ে লাগছে। সে এখন বাফেলো নিউ ইয়র্ক থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে স্লিপি হলোর জঙ্গলে।

স্যাম কোথায়? পাঁচটার সময় তার এখানে থাকার কথা। আজ সকালে তাকে গত কাল রাতের অশরীরী অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে মার্কোস। আলোচনা করে দু' জনেই একমত হয়েছে, এই মূর্তি স্লিপি হলোর জঙ্গলে জলাভূমিতে ফেলে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

একটা পেঁচা ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল। গায়ে কাঁটা দিল মার্কোসের।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কে যেন আসছে। স্যাম, "হ্যালো মিস্টার মার্কোস।"

"ভাবলাম তুমি এলেই না। গাড়িতে ওঠো," বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মার্কোস।

সন্ধে নামছে। কুয়াশায় মোড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মটমট করে ডালপালা ভাঙতে-ভাঙতে চলেছে গাড়ি। ড্রাইভ করছে মার্কোস। দু' জনেই চুপ।

"দাঁড়ান। এবার বাঁ দিকে। ওদিকেই জলাভূমিটা," বলল স্যাম।

ডেল কার্নেগী সমগ্র
অনুবাদ উত্তম ঘোষ। দাম ১২৫ টাকা।
ডেল কার্নেগীর অন্যান্য গ্রন্থ
বন্ধুলাভ ও অন্যের ওপর প্রভাববিস্তার করবে কিভাবে ৩০
উদ্বেগ থামিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে কিভাবে ৪০
নিজের জীবন ও কাজ উপভোগ করবে কিভাবে ২৫
গণভাষণের দ্বারা আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন ও প্রভাববিস্তার করবে কিভাবে ৩০
ফলপ্রদ বাক্যালাপের দ্রুত ও সহজ পথ ৩০
ভোঁদর বাহাদুর ■ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দাম ৩০
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত
নানা রঙের রূপকথা ৫০
বাংলার সেরা অ্যাডভেঞ্চার গল্প ৪০
দুই বাংলার একশো ভৌতিক গল্প ১০০
তিন কন্যা ■ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দাম ৩০ টাকা
সাহিত্য তীর্থ: ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩ Phone 2241 5903

গাড়ি ঘুরল। কিছু দূর গিয়ে ব্রেক কষতে হল মার্কোসকে। সামনে ওটা কী চকচক করছে? ওটা না সরালে গাড়ি এগোতে পারছে না। স্যাম গাড়ি থেকে নামল। এগিয়ে গেল সামনে।

"ওটা কী?" গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে বলল মার্কোস। কোনও জবাব নেই। মার্কোস হর্ন দিতে লাগল বারবার।

"দেখে যান।"

মার্কোস গাড়ি থেকে নামল। এগিয়ে যেতে-যেতে সে বুঝতে পারছে তার পায়ে বল পাচ্ছে না।

"তলোয়ার," বলে সামনে আঙুল দেখাল স্যাম। সত্যিই সামনে খাড়াখাড়িভাবে মাটিতে গাঁথা হয়ে আছে একটা চকচকে তলোয়ার।

মার্কোসের হৃদয়ের একটা স্পন্দন যেন মিস হয়ে গেল। স্যামের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে গাড়ির দিকে দৌড়তে লাগল মার্কোস, "এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলো," বলল সে।

"না। সামনেই জলাভূমি। আপনি গাড়ির ডিকি খুলুন," বলল স্যাম।

ডিকি খুলতেই বেরোল স্লিপি হলোর কাঠের ঘোড়া। দু'জনে ধরাধরি করে নেমে গেল জলের মধ্যে। অভিশপ্ত মূর্তিটাকে বিসর্জন দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসেই ব্যাকগিয়ারে দ্রুত পিছন দিকে চালাতে লাগল মার্কোস। লাল ব্যাকলাইটের আলো পড়ে জঙ্গলটা অদ্ভুত ভুতুড়ে লাগছিল। ঝুমকো গাছগুলো যেন লাল আলোয় হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকছে।

"তাড়াতাড়ি... আরও তাড়াতাড়ি..." বলছিল স্যাম।

ভার্জিনের ফ্লাইটে মেক্সিকো ফিরছে মার্কোস। মূর্তিটা নেই, তাই ফ্লাইটে না ফেরারও কোনও কারণ নেই। চোখ বন্ধ করে আই-পডে গান শুনছিল সে। টেনশন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গান তাকে খুব সাহায্য করে। তার বুক থেকে গত দু' দিনের অদ্ভুত ঘটনাবলির টেনশন এখনও নেমে যায়নি। হয়তো কোনও দিনই নামবে না।

একটা বালিশ পেলে ভাল হত। ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস নেই। সে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। অবাক কাণ্ড... এত বড় বিমানের সারি-সারি সিট সব ফাঁকা। একজন যাত্রীও নেই। কিন্তু নিউ ইয়র্ক থেকে তো যাত্রী বোঝাই হয়ে প্লেন ছেড়েছিল। ককপিটের দরজা খোলা। ইতস্তত করে ঢুকে গেল সে। পাইলট তার দিকে ঘুরল। কিন্তু... এ কী! পাইলটের মুন্ডু নেই!

বিষম খেয়ে ঘুমটা ভাঙল। একজন ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস তাকে বলছে, "আপনাকে একটা বালিশ দেব?"

সে তো তার সিটেই বসে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল মার্কোস। স্বপ্নটা কী অদ্ভুত! কী ভয়ংকর!

সেই সময় স্লিপি হলোর জঙ্গলের জলাভূমির কাছে একটা গাড়ি থামল। দরজা খুলে নামল স্যাম, মানে সম্বরণ বসু। আঙুল থেকে স্টিকিং প্লাস্টারটা খুলে ফেলে দেখল, কাটাটা প্রায় সেরে উঠেছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারটা তুলে নিল। যার জিনিস, সেই হ্যারিকে ফেরত দিতে হবে এটা। হ্যারি এসব টিভি সিরিয়াল নির্মাতাদের ভাড়া দেয়। স্যামও এটা ভাড়া করেই এনেছিল। জলে নেমে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পেয়ে গেল দেড়শো বছরের পুরনো কাঠের ঘোড়ার মূর্তিটা। স্লিপি হলোর গাছ থেকে তৈরি হওয়া এবং ট্রুহ্যালুইন ডট কম ওয়েবসাইটের গল্প তার বানানো হলেও এটার দাম পাঁচ হাজার ডলারের কম নয়, সে আন্দাজ সম্বরণের আছে।

আসলে মেক্সিকান লোকটির ব্যবহারটাই ছিল খারাপ। টিপ্‌স না দিয়ে মেজাজটা খারাপ না করে দিলে কি আর ভৌতিক গল্পটা বানিয়ে ওকে জব্দ করার কোনও দরকার হত? গল্পটা বিশ্বাস করানোর জন্য স্রেফ দু'টো ব্যাপার করেছিল সে। ঘরের আলো নিভে যেতেই কাচের লাইটারটার মুন্ডু ভেঙে দেওয়া এবং পকেটের নেল-কাটার দিয়ে নিজের আঙুল কেটে সামান্য রক্তপাত ঘটিয়ে কাঠের ঘোড়ার গায়ে লেপে দেওয়া।

বাকিটা নিজে থেকেই হয়েছে। শিস দিতে-দিতে ডিকি খুলে মূর্তিটা আর তলোয়ারটা রেখে গাড়ি স্টার্ট দিল সম্বরণ। স্লিপি হলোর জঙ্গলের পথ দিয়ে এগিয়ে চলল তার গাড়ি। গন্তব্য, নিউ ইয়র্ক।

ছবি: অনুপ রায়

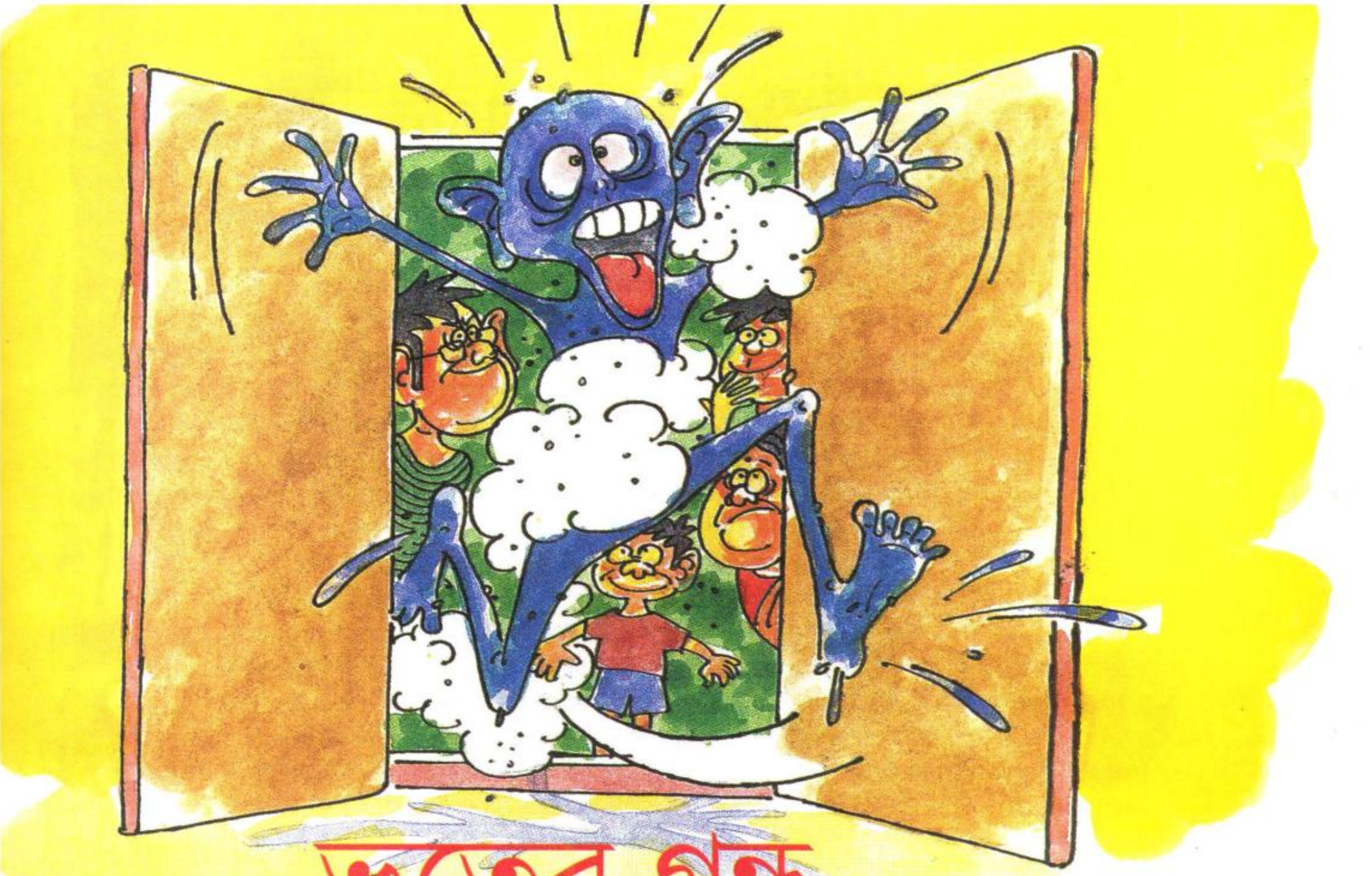

ভূতের গন্ধ

শ্যামল দত্তচৌধুরী

আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতেই আমি ভূত হয়ে গেলাম। আমি দেখলাম, হাসপাতালের বারান্দায় আমার বাবা হাউহাউ করে কাঁদছেন। আর আমার মা? মা'র অবস্থা দেখে ভূতের চোখেই জল এসে গেল। ভূতের তো আর মানুষের মতো চোখ নেই। তার সমস্ত অনুভব হৃদয়ে। সেই জন্য দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-আনন্দ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ জোরালো। আমার ছোট-ছোট ভাইবোন হাসপাতালের ওয়ার্ডে অন্য রোগীদের ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। এখন মা-বাবার কান্না শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আমি পড়াশোনায় ভাল ছেলে ছিলাম। গত বছর বৃত্তিপরীক্ষায় সারা জেলায় আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। বিজ্ঞান আর অঙ্ক আমার প্রিয় বিষয়। আমার বাবা সাইকেলরিকশা চালান। আমার মা ঠিকেকাজ আর রান্নার কাজ করেন এবেলা-ওবেলা তিনটে বাড়িতে। ওঁদের খুব ভরসা ছিল আমি বড় হয়ে ভাইবোনদের লেখাপড়া শেখাব। ইচ্ছে তো আমারও ছিল, কিন্তু কী করব! আমি কি আর শখ করে মরতে গিয়েছি? বেশ কিছুদিন ধরে পেটে তীব্র যন্ত্রণা। রক্তবমি। পুজোমানত, ঝাড়ফুঁক সব ফেল। দিনকতক লোকাল কবরেজবদ্যি, হোমিওপ্যাথি, তারপর সদর হাসপাতাল। দু' দিন হাসপাতালের বারান্দায় গলার নলিকাটা পশুর মতো ছটফট করলাম ব্যথায়। কেউ কি আমাকে চিকিৎসা করে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল? বড়-মেজো-সেজো ডাক্তাররা গটগটিয়ে যাতায়াত করেছেন। সেবাকর্মীরা আমাকে আলুর বস্তার মতো এখানে-ওখানে ধুপধাপ ফেলেছে, যেন ওটা আমি নই, আমার ডেড বডি। আমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মা ছুটে-ছুটে কেঁদে-কেঁদে কত লোকের পায়ে পড়েছেন, কেউ ফিরেও তাকায়নি। হাসপাতালের মাঠে নাচগানের ফাংশন হবে, সকলে সেই নিয়ে ব্যস্ত। তবে! আমার কী দোষ? আমি মরেই গেলাম।

আমার ভূতটাকে টানাটানি করে শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিয়েই আমি শূন্যপথে দে দৌড়। আঃ, কী আরাম! এখন আমার শরীরে কোনও জ্বালাযন্ত্রণা নেই। আমার শরীরই তো নেই, এখন আমি ভূত। রাতবিরেতে মানুষদের বেশ ভয় দেখাতে পারব।

পৃথিবীটা ছোট হতে-হতে দূরে চলে যাচ্ছে। উথালপাথাল গুচ্ছ-গুচ্ছ বাতাসের স্রোত উঠছে-নামছে। তার মধ্যেই ডিগবাজি খাচ্ছে কয়েকটি লিকলিকে জীব। লকপক করছে তাদের হাত-পায়ের হাড়গুলো, চোখ ঢুকে গিয়েছে গর্তে, নাকের জায়গায় কেবল ফুটো, পেট যেন ঢুকে গিয়েছে পিঠের মধ্যে। কুৎসিত চেহারা। কারও আবার বিড়ালের মতো মুখ, মুলোর মতো দাঁত। ছোট্ট দু'টো গুলি হাত, লাল জবার মতো ভাঁটা-ভাঁটা চোখ। বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে শ'য়ে-শ'য়ে এরকম জীব উঠছে-পড়ছে। আমি ভয় পেয়ে অন্য দিকে ভেসে পড়তে গিয়েছি, কে যেন বলে

উঠল, "উঁহু, ওদিকে নয়, রাস্তা সিধে আকাশ বরাবর।"

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, আমার পাশে-পাশে চলেছে যমদূতের মতো চারটে লোক। ইয়া বড়-বড় গোঁফ, তেল চকচকে ভুঁড়ি, মালকোচা মেরে ধুতি পরেছে। তাদের হাতে লাঠি, অঙ্কুশ, কশা, একজনের হাতে মেশিনগান। সে বোধ হয় নেতা।

আমি চমকে উঠে বললাম, "তোমরা কারা?"

নেতা বলল, "আমরা যমের অনুচর। যমদূত। তোমাকে যমরাজের সংযমনি পুরীতে নিয়ে যেতে এসেছি। হাসপাতালের বেড থেকেই তোমার কাছে-কাছে আছি। আমার নাম সুচিমুখ।"

"আমার নাম...।"

"জানি।" একটা নোটবই দেখে সুচিমুখ বলল, "এই তো তোমার বায়োডেটা। তোমার নাম জানি, তোমার পিতার নাম জানি, বয়স, ঠিকানা সব জানি।"

"তোমরা এত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছ, আমাকে কি সন্ত্রাসবাদীর ভূত ভেবেছ?"

"অনেকে যেতে চায় না, তখন তাদের প্রহার করতে-করতে সংযমনি পুরীতে নিয়ে যেতে হয়।"

"সংযমনি পুরী! সে আবার কোথায়, পুরীর কাছাকাছি?"

"ওই হোথায়...মনুষ্যলোক থেকে যমলোকের দূরত্ব ছিয়াশি হাজার যোজন, অর্থাৎ তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ক্রোশ। এই রকম দুরন্ত গতিতে চললে পৌঁছতে তিনশো আটচল্লিশ দিন টাইম লাগে।"

আমি বললাম, "যোজন, ক্রোশ তো আর আজকাল ব্যবহার হয় না। কিলোমিটারে বললে সুবিধে হত।"

সুচিমুখকাকু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, "হিসেবটা খুব সোজা। ক্রোশ থেকে মাইলে নিয়ে যাও, তারপর কিলোমিটার। চাইলে মিটার-মিলিমিটারেও বের করে দিতে পারি। ক্যালকুলেটর আছে? সে কী, নেই! পৃথিবীতে শুনেছি দু'য়ে-দু'য়ে যোগ করতেও নাকি ক্যালকুলেটর লাগছে।"

আমি ডিগবাজি খাওয়া জীবগুলোকে দেখিয়ে বললাম, "ওগুলো কী?"

"প্রেত। মর্তলোকের কাছাকাছি থাকে। টপাটপ পুনর্জন্ম নিয়ে নেয়।"

আমি হঠাৎ দেখি কী, একটা বোয়িং প্লেন একদম ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, "পালাও, পালাও! এক্ষুনি ধাক্কা মারবে প্লেন।"

সুচিমুখ হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠে বলল, "ধাক্কা মারবে? তুমি তো মরে ভূত হয়েই গিয়েছ।"

দেখতে-দেখতে প্লেনটা গুমগুম করে আমাদের ভেদ করে চলে গেল। আলোকিত জানলায় সারি-সারি মুখ বসে আছে। ওরা আমাদের দেখতেই পেল না। আমি বললাম, "প্রেতগুলো বাতাসের নামা-ওঠার সঙ্গে ওলটপালট খাচ্ছে। তার মানে আমরা এখনও ট্রোপোস্ফিয়ার ছাড়াইনি।"

"কীসের ফিয়ার?"

"ফিয়ার নয় কাকু, স্ফিয়ার। গোলক। গগন মণ্ডল। ভূপৃষ্ঠ থেকে চোদ্দো কিলোমিটার পর্যন্ত এই ট্রোপোস্ফিয়ার স্তরের বিস্তার। শেষ সীমায় বায়ুমণ্ডলের চাপ শতকরা দশ ভাগে নেমে আসে। দেখছ না, আমাদের গতি কেমন বেড়ে যাচ্ছে?"

সুচিমুখ গম্ভীর মুখে বলল, "হুঁ, ছেলেবেলায় যেন পড়েছিলাম মনে পড়ছে। তখন ওটাকে 'প্রেতলোক' বলা হত। তার উপরে আছে 'পিতৃলোক'।"

"ভূপৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তর, তার চল্লিশ কিলোমিটার উপর পর্যন্ত মেসোস্ফিয়ার। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সীমানা থেকে আয়নোস্ফিয়ার শুরু, তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়নমণ্ডলে ক্রমাগত পরমাণু চূর্ণ হতে-হতে নেগেটিভ আর পজিটিভ কণায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আলোয় আলোময়!"

"আহা, ওই একই হল। তুমি যাকে স্ফিয়ার বলছ তাকেই আমরা ছেলেবেলায় 'লোক' বলতাম... ওই গোলোক আর কী!"

হঠাৎ অনুভব করলাম ঠান্ডা বেড়ে গিয়েছে খুব। আমার যে ভূতের শরীর, তা-ও হি হি করে কাঁপছে। বললাম, "বড্ড শীত করছে কাকু!"

"যত দিন যাচ্ছে ততই যেন উপরের দিকে শীত বাড়ছে। মাত্র তিরিশ বছর আগেও এমন ঠান্ডা ছিল না। উচ্চ স্তরের ভূতেরা এখন শীতের দাপটে তিষ্ঠোতে না পেরে মর্তলোকের দিকে নেমে যাচ্ছে। ওই দ্যাখো!"

আমার মতো হাজার-হাজার ভূত সাঁইসাঁই নেমে আসছে উপর থেকে, ঠকঠক করে কাঁপছে। কঙ্কালভূতদের হাড়ে-হাড়ে খটখটানি শব্দ। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রবল শীতের হাত থেকে পালাচ্ছে। যত উপরে উঠছি আমারও প্রাণ যায়-যায়। একজন ভূতকে ডেকে বললাম, "উরে বাবা, তোমাদের দেশে কী শীত!"

ভূতটার কথাবার্তাও বোধ হয় ঠান্ডায় জমে গিয়েছে, কোনও মতে "মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে, পালাও," বলতে-বলতে সে গতি বাড়িয়ে পালাল।

সুচিমুখকাকুও কাঁপছে। বলল, "গরম জামা, ওভারকোট ছাড়া আর চলছে না। যমরাজের কাছে দরখাস্ত দিয়ে-দিয়ে হয়রান, কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না কেউ...।" তারপর অল্টিমিটারের মতো একটা যন্ত্র বের করে বলল, "ন'শো অষ্টআশি ক্রোশ এসে পড়েছি। এর বেশি যমদূতদের যাওয়ার অনুমতি নেই, টা-টা বাই-বাই...।"

বলতে-বলতে তারা উধাও। সংযমনিপুরী এখনও অনেক দূর। ওরা অবশ্য রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। যাম্যপুরী, সৌরিপুর, নগেন্দ্রনগর ইত্যাদি ষোলোটা পুরী পার হয়ে তবে যমরাজার দেশ। এদিকে শীতের চোটে আমার কাহিল অবস্থা। একা-একা প্রতিকূল পরিবেশে আমার খুব ভয় করতে লাগল। ভূতদেরও ভয় করে আগে জানতাম না।

এই সময় দেখা হল, একজন দাড়িওয়ালা ভূতের সঙ্গে। তার দু' হাতে টেস্টটিউব, মেঘের মতো কী একটা পদার্থ ঢালাঢালি করতে-করতে অন্যমনস্কভাবে চলেছে। আমার দিকে চশমার কাচের উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল, "আসার সময় কিছু 'ওজোন' এনেছ নাকি?"

আমি বললাম, "ওজোন স্তর ছেড়ে এসেছি অনেক নীচে সেই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে। খুব দুরবস্থা, ওজোনের প্রলেপ জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া, দেখলাম, সূর্যের মারাত্মক আলট্রাভায়োলেট রশ্মি হুড়মুড় করে ধেয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর দিকে। এখানে ওজোন পাব কোথায়?"

"বুদ্ধি করে সঙ্গে কিছু আনলে পারতে। মাঝে-মাঝেই পি.এইচ. মাপা খুব জরুরি, জানো না?... আমার আবার লেকচার আছে মর্তলোকে।"

"এখানে এত শীত কেন?"

"আরে ওই জন্যই তো সকলে মর্তলোকের দিকে চলেছে! শীতের দাপট বৃদ্ধিই হচ্ছে আমার লেকচারের বিষয়। এই নিয়ে আমি আড়াইশো বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। তা, তুমিও চলো আমার

সঙ্গে। লেকচারের সময় শ্রোতা না থাকলে ঠিক জমে না।"

"কিন্তু আমার যে সংযমনিপুরী যাওয়ার কথা!"

"সে যাবে না হয় ক' দিন পরে। আজকাল প্রসাশন ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছে, কেউ খেয়াল করবে না... চলো-চলো, আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার।"

কী আর করি! শীতের ভয়ে এমনিতেই আর উপর দিকে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তাই গবেষক ভূতের সঙ্গে আমি পাড়ি দিলাম পৃথিবীর দিকে। দলে-দলে ভূত-প্রেত সমেত আমরা এক ফাঁকা ময়দানে নেমে পড়লাম। প্রেতগুলো কিচিরমিচির হল্লা করতে-করতে গাছে চড়ে বসল। এখানকার আবহাওয়া সকলেরই বেশ পছন্দ হয়েছে। রাত দু'টো নাগাদ যথেষ্ট নাতিশীতোষ্ণ।

গবেষকভূত বলল, "যখন স্থুল শরীরে ছিলাম, এই শহরেই আমি রিসার্চ করতাম। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। এই ময়দানকে শহরের ফুসফুস বলা হয়, যদিও এখন দেখছি স্থানে-স্থানে যক্ষ্মা লেগেছে...।"

আমি জেলার ছেলে। আগে কখনও কলকাতাপুরীতে আসিনি। তবে হাওড়া ব্রিজ দেখেই চিনেছি, আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। তার মাথায় পরি দিব্যি ঘুরছে।

আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, "আরে, ওই তো পরি ঘুরছে! তবে যে শুনেছিলাম পরি আর ঘোরে না?"

আমরা একটা ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা ল্যাকপেকে প্রেত সড়াত করে হড়কে নেমে এসে বলল, "ঘুরবে কী করে? আমি পরিবার নিয়ে ওই গম্বুজেই থাকি কিনা, পরির গায়ে মশারির দড়ি খাটাই। আজ কাচ্চাবাচ্চা পুরো ফ্যামিলি সমেত প্রকাশ্য সমাবেশে এসেছি, তাই আমার পেতনি দড়ি খুলে মশারি গুটিয়ে রেখে এসেছে। ছাড়া পেয়ে পরি ঘুরতে লেগেছে।"

দলে-দলে ভূতপ্রেত আকাশপথে এসে ময়দানে নামছে। ময়দান ভূতে ভূতারণ্য। শুনছি ভূতের রাজাও নাকি আসবে। যে যত গুরুত্বপূর্ণ সে তত লেটে আসে। এক সময় এল রাজামশাই। চারজন স্কন্ধকাটা ভূতের কাঁধে তার মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসন অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। লক্ষ-লক্ষ ভূত জয়ধ্বনি দিতে লাগল। ভূতের রাজা হাড়গোড় চিবোতে-চিবোতে একপাল শিয়াল-কুকুর সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে উঠল। গবেষকভূতের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমিও মঞ্চে জায়গা পেয়ে গেলাম। রাজা সৌজন্য প্রকাশ করতে আমাকে একটা মোটা ফিমার বোন চিবোতে দিল।

কোলাহল থামলে ভূতেদের ঘোষক বলল, "বন্ধুগণ, আমাদের আজ মহাদুর্দিন। মানুষের পাপে আমরা উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছি। যবে থেকে মানুষ মর্তলোকে আছে তার আগে থেকে এখানে আমাদের বাস। এককালে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার আর তাদের ভূত বাস করত মর্তলোকে। কালের প্রভাবে তারা লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর মানুষ এসেছিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ভূত। তাই মর্তলোকের অধিকার মানুষের চেয়ে ভূতদের বেশি। অথচ, আজ আমাদেরই অস্তিত্ব মানুষ বিপন্ন করে তুলেছে। অসহ্য শীতের প্রকোপে আমরা নিজের-নিজের লোক থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। এই অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজতে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। মহামান্য রাজামশাইয়ের সভাপতিত্বে এবার অধিবেশন শুরু হচ্ছে।"

ভূতের রাজা ঝিমোচ্ছিল। মহামন্ত্রীর খোঁচা খেয়ে আচমকা বলে উঠল, "গবেষকভূতকে বক্তব্য রাখতে আদেশ করছি।"

আমি নড়েচড়ে বসলাম। ফাইল, কাগজপত্র দরকার মতো এগিয়ে দিতে হবে। গবেষকভূত চশমা মুছে ভারিক্কি চালে বলতে লাগল, "সকল অনর্থের মূল ওই মানুষ। যেহেতু তারা আমাদের অতীত এবং পুনর্জন্ম নিলে আমাদের ভবিষ্যৎ, তাই আমরাও এই সর্বনাশের দায় এড়াতে পারি না। আজ আমাদের মাথায় সত্যি-সত্যি আকাশ ভেঙে পড়ছে।

"আপনারা সকলেই জানেন, মানুষগুলো দূষণ ব্যাপারটা নিয়ে বাইরে-বাইরে গলাবাজি করে, কিন্তু তলে-তলে বিপরীত কাজটাই করে সৃষ্টিকে রসাতলে পাঠাবার জোগাড় করেছে। জ্বালানি তেলের ব্যবহার যত বাড়ছে বায়ুমণ্ডলে ততই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। প্রগতি আর উন্নয়নের খাতিরে গাছ কেটে ফেলা তো আছেই! ফলে ভূপৃষ্ঠ যেমন উষ্ণ হয়ে উঠছে, উপরের স্তরের বায়ুমণ্ডল তেমনই দ্রুত শীতল হয়ে পড়ছে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, উপর দিকে শীতল হয়ে যাওয়ার অনুপাত পৃথিবীর উষ্ণ হয়ে ওঠার তুলনায় অনেক বেশি। পঞ্চাশ থেকে একশো কিলোমিটার উপরের তাপমাত্রা গত দশ বছরে দু' থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছে।

"কোনও বস্তুকে শীতল করতে থাকলে কী হয়? তার সংকোচন হয়। অতএব উপরের স্তরের বায়ুমণ্ডল ক্রমশই সংকুচিত হতে-হতে গত তিরিশ বছরে প্রায় আট থেকে দশ কিলোমিটার নেমে এসেছে পৃথিবীর দিকে। সত্যি-সত্যি আকাশ ভেঙে পড়ছে। আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, ভারতবর্ষের উপরিস্তরের আবহাওয়া গত তিরিশ বছরে দশ ডিগ্রি শীতলতর হয়ে পড়েছে...।

"আমেরিকার বিজ্ঞানীভূতদের গবেষণা অনুযায়ী, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নামমাত্র বৃদ্ধি পেলেও, আয়নোস্ফিয়ারে তার বিশ গুণ ঠান্ডা নেমে আসে। এখানে যদি বাড়ে হাফ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আমাদের লোকে পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি উত্তাপ কমে যায়।

"সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেন আজ আমরা গৃহহীন, কেন শীতের চোটে ঘরবাড়ি ছেড়ে আমাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে। তাই আমি রাজামশাইয়ের কাছে আর্জি জানাচ্ছি, মানুষকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হোক।"

সমবেত ভূতপ্রেত প্রবল হাততালিতে গবেষকভূতের বক্তব্য সমর্থন করল। তারপর নানা সাইজের কয়েকটা ভূত, কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ বাঁকা, কেউ সোজা, বেশ জ্বালাময়ী ভাষণ দিল। শেষে শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে এমন কলরব জুড়ে দিল যে, বক্তাদের স্বরই ডুবে গেল।

রাজামশাই ঝিমোচ্ছিল। মহামন্ত্রীর খোঁচা খেয়ে বলে উঠল, "অনেক জ্ঞানীগুণী ভূতের অভিমত জানা গেল। আমাদের হেনস্থার জন্য মানুষই দায়ী। এই বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। যারা বাতাস বিষিয়ে দিয়েছে, আলো নিভিয়ে দিয়েছে, তাদের ক্ষমা নেই, তাদের ভালবাসা যায় না। অতএব আমার নির্দেশ, তোমরা মানুষের ঘরে-ঘরে ঢুকে পড়ো। তাদের ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে তাড়াও। যারা আমাদের উদ্বাস্তু করেছে, তাদেরও আমরা ভিটেছাড়া করে ছাড়ব। আমরা মর্তলোক অধিকার করে নেব, যাও।"

"ভূতেদের কাণ্ডকারখানা খুব সংগঠিত।

ইতিমধ্যে সমাগত ভূতপ্রেতকে ছোট-ছোট দলে ভাগ করা হয়ে গিয়েছে। আমাকে যে দলটায় রাখা হয়েছে, তাতে আমার মতো আরও নাবালক ভূত আছে। দলের নেতা একজন অভিজ্ঞ ব্রহ্মদৈত্য। ভয়ংকর চেহারা। আমি যে ভূত, তাকে দেখে আমারও ভয় পেয়ে গেল।"

ব্রহ্মদৈত্য বলল, "এক মাঝারি হাউজিং এস্টেট আমরা দখল নিতে যাব। একটু আগে আমি সরেজমিন তদন্ত করে এসেছি। খুব সুন্দর বাসস্থান, ভূতপ্রেতের উপযুক্ত। ড্রেন, নালি সব বন্ধ, বিষ্টি হলেই চারদিকে হাঁটুজল সাতদিন, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের দুর্গন্ধ, দেওয়ালের পলেস্তরা খসে পড়ছে, অশ্বত্থগাছ গজিয়েছে, দরজা-জানলার কাঠ জল খেয়ে বেঁকে গিয়েছে, সুইচে হাত লাগালেই কারেন্ট, কে বলবে বাড়িগুলো মাত্র বছর পাঁচেক আগে তৈরি হয়েছে। চারদিকে এনতার আবর্জনা, মরা বিড়াল-কুকুর ছড়িয়ে পড়ে আছে।"

ভূতদের এক-একটা দল, নেতার পিছু-পিছু সাঁইসাঁই করে উড়ে গেল এক-এক দিকে। আমার ভূতজীবন সবে শুরু হয়েছে, তাই ব্রহ্মদৈত্য নেতা আমাকে আর অন্য নাবালক ভূতদের চট করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দিল। কয়েকটা চটি বইও বিলি হয়ে গেল 'সহজ ভয় দেখাবার পদ্ধতি'। জানা গেল, মানুষদের ভয় দেখানো নাকি উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছে। তারা ভূত বিশ্বাসই করে না, তা হলে ভয় পাবে কী করে! শহরে বাঁশবন নেই, ঝিঁঝিপোকার ডাক নেই, মজা জলায় আলেয়া নেই, অন্ধকারে কলাগাছের দুলুনি নেই। ভয় দেখানো কি সোজা কথা?

ছোট একটা ফ্যামিলিকে ভয় দেখিয়ে ঘরছাড়া করার দায়িত্ব দেওয়া হল আমাকে। রাত শেষ হওয়ার আগেই আমি খুপরি ফ্ল্যাটটার স্যাঁতসেঁতে বাথরুমের কোণে একটা মুড়ো ঝাঁটার ভিতরে সাঁত করে সেঁধিয়ে গেলাম। ঝাঁটা নড়ে উঠল। কর্তার ঘুম খুব সজাগ। পাশের ঘর থেকে বাজখাঁই গলায় বললেন, "বাথরুমে কে রে? ভূতটুত নাকি!"

এই রে, ধরে ফেলেছে। কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে এসেই খেয়াল হল, ওরা আমাকে চোখে দেখবে কী করে, আমি তো ভূত!

ঘুমন্ত গিন্নিকে ঠেলে তুলে কর্তা বাতাস শুঁকতে-শুঁকতে বললেন, "ঘরে হঠাৎ কেমন গন্ধ পাচ্ছি, বোধ হয় ভূত ঢুকেছে!"

গিন্নি পাশ ফিরে বললেন, "সাতসকালে এমন হল্লা করছ কেন? ঝাঁটা মেরে তাড়াও।"

কর্তা বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না, রোজকার স্বাভাবিক গন্ধ, না ভূতের গায়ের গন্ধ। তুমি পারছ?"

"আঃ, জ্বালাতন কোরো না, ঘুমোতে দাও।"

কর্তা বিছানা ছেড়ে উঠে নাকমুখ কুঁচকে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে ঘরের কোণে-কোণে ঘুরতে লাগলেন। কে জানত, মানুষের নাক ভূতের গন্ধ পায়! এবার কিছু করতে হয় আমাকে। মাঝরাত হলে দিব্যি এক্‌টোপ্লাজম-এর সাহায্যে দেহধারণ করে লোকটার ঘাড় মটকে দেওয়া যেত। কিন্তু এখন ভোরের আলো ফুটছে, আলো যত বাড়বে ভূতের শক্তি ততই কমবে। তা ছাড়া ভূতদের পদ্ধতিতে ইদানীং বিস্তর সংশোধন হয়েছে। বলপ্রয়োগ, খুনখারাপি একদম নিষেধ। তাই আমি বিকট খ্যাঁকখ্যাঁক শব্দ করে হেসে উঠলাম, ভয় দেখাবার জন্য।

কর্তা বললেন, "গিন্নি, ও গিন্নি, ওঠো, জাগো, ঘরে ভূত ঢুকেছে। আজ ব্যাটাকে তাড়িয়ে ছাড়ব। অফিস কামাই হয় হোক! কী সাহস, ঢুকেছে কিনা আমার বাসায়!"

গিন্নি ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। লাগোয়া ঘরটার মেঝেয় বিছানা করে দু'টো ছেলে ঘুমোচ্ছিল। তাদের ঘুম থেকে তুলে গিন্নি বললেন, "ওরে বড় খোকা, ছোট খোকা, তোরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ইশকুলে বেরিয়ে পড়। ঘরে ভূত ঢুকেছে।"

ছেলেরা হাই তুলে বলল, "কী আপদ! বাবাকে বলো চটপট বিদেয় করতে।"

তারপর দুঃখের কথা আর কী বলব! সারাদিন ধরে কর্তাগিন্নির সঙ্গে আমার তুমুল যুদ্ধ চলল। ওঁরা দু' হাতে ঝাঁটা বাগিয়ে এলোপাথাড়ি বাতাসে পিটছেন, শুকনো লঙ্কা পোড়াচ্ছেন, ধুনো ওড়াচ্ছেন, সরষে ছুড়ছেন। আর সেই সঙ্গে বিশ্রী গালমন্দ! উঃ, কী যে নাজেহাল অবস্থা! আমি যথাসাধ্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। নীচে আঁস্তাকুড় থেকে মরা ইঁদুর-চামচিকে এনে ছুড়েছি, থালাবাসন, ছবির ফ্রেম ঝনঝনিয়ে ফেলে দিয়েছি, গিন্নির আলমারিতে পচা মাছ গুঁজে রেখেছি, আর মাঝে-মাঝেই ঘর কাঁপিয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক হেসে উঠেছি। একটা শিক্ষানবিশভূত আর কত পারে?

দিন গড়িয়ে সন্ধে হল। বড় খোকা, ছোট খোকা স্কুল থেকে ফিরে মা-বাবার সঙ্গে ভূত তাড়াতে নেমে পড়েছিল। আমি খোনা গলায় ভয় দেখাতে-দেখাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শেষে সাময়িক রণে ভঙ্গ দিয়ে আমি ব্রহ্মদৈত্য নেতার সঙ্গে কনসাল্ট করতে গেলাম।

নেতার হাল বেশ শোচনীয়। সে বাড়ির গিন্নি ওকে এক বোতলে ভরে দিনভর গ্যাস ওভেনে সেঁকেছেন, তার পর কর্তা বাড়ি ফিরে তাকে বস্তায় পুরে খুব পিটিয়েছেন। দড়ির ফাঁস একটু আলগা হতেই ব্রহ্মদৈত্য সুড়ুৎ করে বেরিয়ে ঘরের ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। যখন আমি পৌঁছলাম, সে চিত হয়ে শুয়ে হু-হু-হু করে কাঁদছিল।

এমন সময় আমাদের মহামন্ত্রীর খাস দূত এক মামদোভূত এসে খবর দিল, এক্ষুনি বিশেষ জরুরি অধিবেশন বসবে, সকলের হাজিরা চাই। আমরা আমাদের দলটাকে জুটিয়ে নিয়ে নিমেষে ব্রিগেডে গিয়ে হাজির হলাম।

আপামর ভূতপ্রেতের অবস্থা আমাদের মতোই। মানুষের কাছে তারা নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়ে এসেছে। রাজামশাই অনুপস্থিত। শহরের সবচেয়ে বড় বাসভবনে ঢুকছিল। রাজার পক্ষে তেমন বাড়িই মানানসই। সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা রাজাকে একটা লম্বা বেলুনের মধ্যে বন্দি করে ফেলেছে, রাজা কুকুরকুণ্ডলি পাকিয়ে বাগানে পড়ে আছে।

মহামন্ত্রী বলল, "বন্ধুগণ, এই দেশে আমাদের যোগ্য সমাদর কেউ করছে না। আমার সিবিআইভূতেরা তদন্ত করে এই দু' হাজার আটশো সাতাত্তর পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেছে। সংক্ষেপে তার বক্তব্য এই যে, মর্তলোকে কোনও মানুষ নেই। গ্রহান্তরের ভূতপ্রেতরা বহু বছর আগে থেকেই মানুষ সেজে বাস করছে এখানে। তারাই মর্তলোক চালাচ্ছে। পৃথিবীটাকে ধ্বংস করাই তাদের লক্ষ্য। ভাই সব, চলো, আমাদের চলে যেতে হবে অন্য কোনও বাসযোগ্য গ্রহে। যদি গ্রহান্তরের ভূতরা আমাদের গ্রহে রাজত্ব করতে পারে, তাহলে আমরাই বা যাব না কেন?"

পুরনো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে কার না মন খারাপ হয়? ভূতপ্রেতের দল ভারী মন নিয়ে পঙ্গপালের মতো শনশন করে আকাশ ছেয়ে উড়ল। ভিক্টোরিয়ার পরি ছাড়া পেয়ে ঘুরতে লাগল আবার।

ছবি: সুদীপ্ত মণ্ডল

মজাদার গোয়েন্দা কমিক্স ● তৃতীয়াংশ এ সংখ্যায়

গল্প: সুদীপ্ত নাগ

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

?!
!
?!
ভুলভুলাইয়ার হাত থেকে ছাড়া পেলেও আমার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া এত সোজা নয় চাঁদুবাবু। প্রথমেই টাকওয়ালা পাগল শুনে আমার সন্দেহ হয়েছিল।
আমার কি একার টাক নাকি? তা ছাড়া কে বলল, পাগলদের টাক হয় না? আমি গোপালপুর গ্রামে চারজন টাকওয়ালা পাগলকে চিনি, জানেন?
আরে, চটছেন কেন? আপনি যদি পাগল না হতেন, তা হলে কি ইঁদুর হয়ে সিংহের গুহায় মুখ ঢোকাতেন? আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না।
এই বললেন ইঁদুর, আবার ছুঁচো বলছেন। আপনার কথার ঠিক নেই কেন বলুন তো?
আপনাকে কি ছুঁচো বলেছি নাকি? আপনি তো অনেক বাঘ মেরেছেন। আজ দেখব বাঘের সামনে কী করেন?
তার মানে?
চাঁদুবাবু, আপনি তো অনেক বই পড়েন। 'গ্ল্যাডিয়েটর' কথাটা শুনেছেন?
অ্যাঁ! মানুষে পশুতে যুদ্ধ!!
হ্যাঁ, আজ তাই হবে।
আপনি যে বলেছিলেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন না।

তাই তো এই ব্যবস্থা করেছি। পারলে দুলাল দাসের মতো বাঘকে খালি হাতে মারুন। হা... হা...
তখন ভৈরবের বাড়িতে...
ব্যাঙরা ডাকে গ্যাঙর গ্যাঙ
কুকুর মারে মানুষকে ল্যাঙ
চাঁদুবাবুর অস্ত্র কাতুকুতু
দারোগা একটুতেই অতুপুতু
পেন পড়ে যায়।
আরে কালীচরণ! এত রাতে কবিতা শুনতে নাকি?
না, না, কবিতা নয়। পাগল নাকি?
ভৈরব, আমি জানি জগমোহনবাবুরা ডাবলার জঙ্গলে আছে। তুমি তাড়াতাড়ি তোমার আদিবাসী প্রজাদের খবর দাও।
সঙ্গে একটা কবিতার খাতাও রাখি। কখন কী কাজে লাগে, বলা যায় না।
ভৈরবের ঠাকুরদাকে ডাবলার জঙ্গলের আদিবাসীরা 'রাজা' বলে মানত।

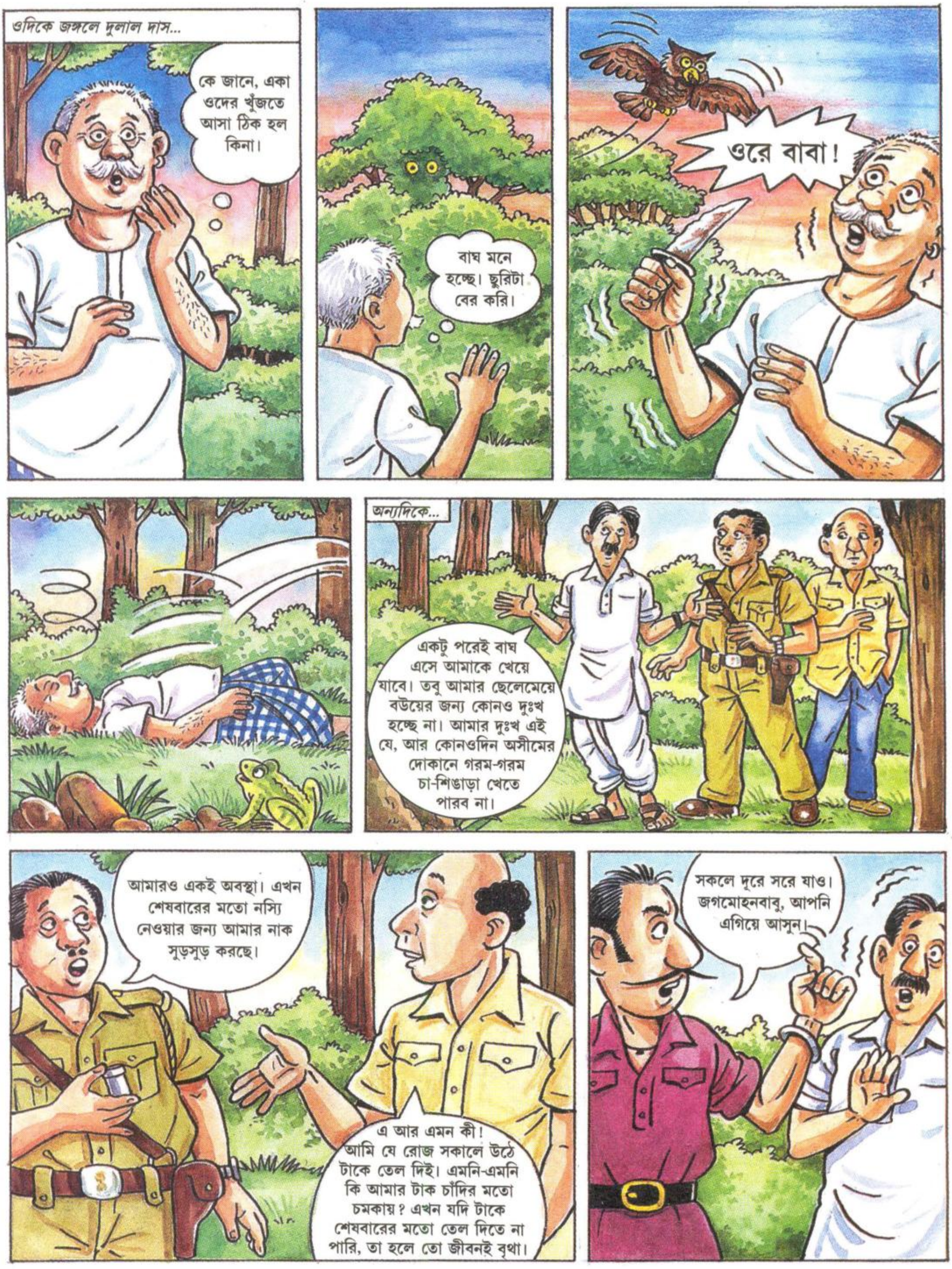
ওদিকে জঙ্গলে দুলাল দাস...
কে জানে, একা ওদের খুঁজতে আসা ঠিক হল কিনা।
বাঘ মনে হচ্ছে। ছুরিটা বের করি।
ওরে বাবা!
অন্যদিকে...
একটু পরেই বাঘ এসে আমাকে খেয়ে যাবে। তবু আমার ছেলেমেয়ে বউয়ের জন্য কোনও দুঃখ হচ্ছে না। আমার দুঃখ এই যে, আর কোনওদিন অসীমের দোকানে গরম-গরম চা-শিঙাড়া খেতে পারব না।
আমারও একই অবস্থা। এখন শেষবারের মতো নস্যি নেওয়ার জন্য আমার নাক সুড়সুড় করছে।
এ আর এমন কী! আমি যে রোজ সকালে উঠে টাকে তেল দিই। এমনি-এমনি কি আমার টাক চাঁদির মতো চমকায়? এখন যদি টাকে শেষবারের মতো তেল দিতে না পারি, তা হলে তো জীবনই বৃথা।
সকলে দূরে সরে যাও। জগমোহনবাবু, আপনি এগিয়ে আসুন।

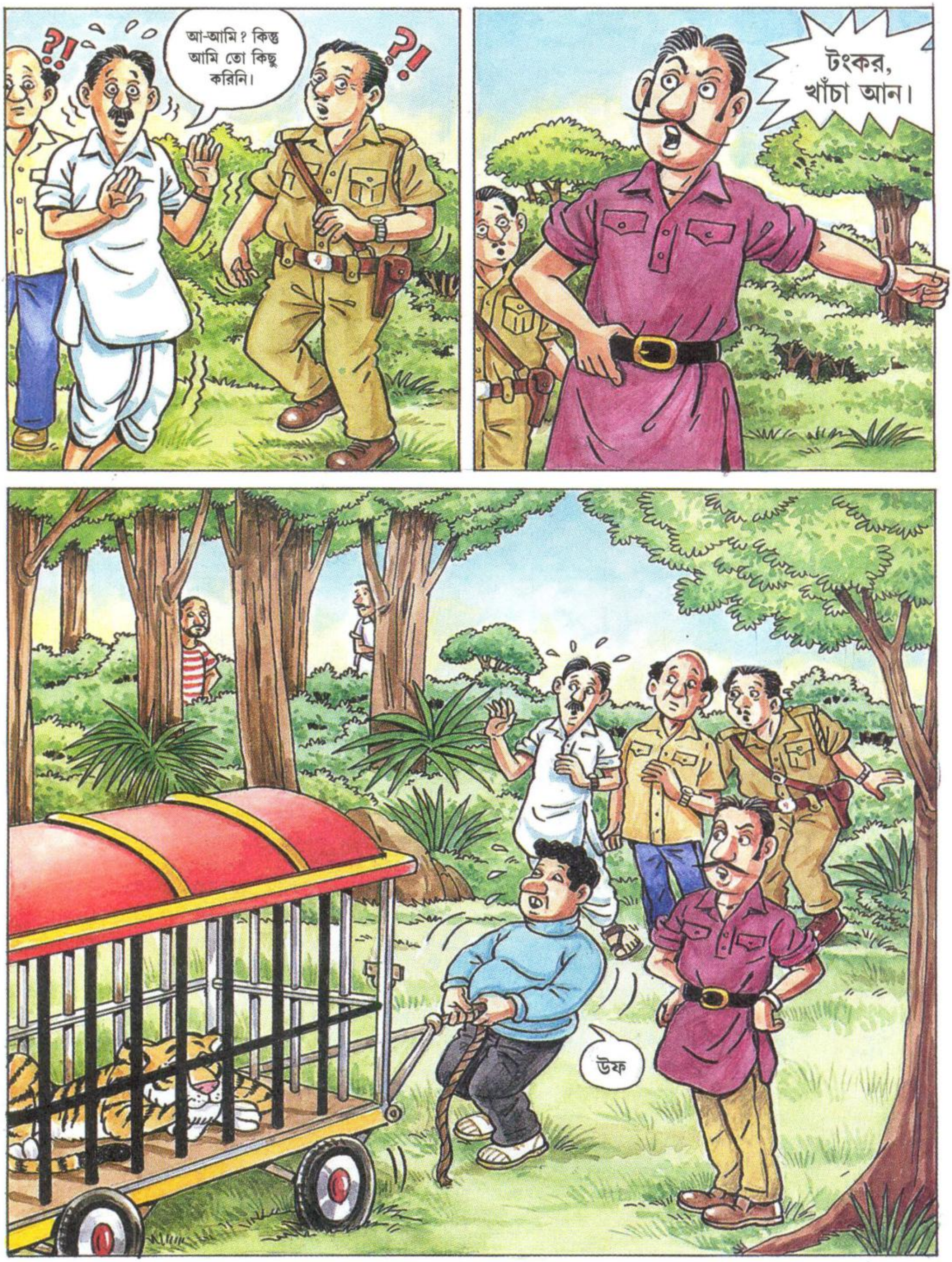

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

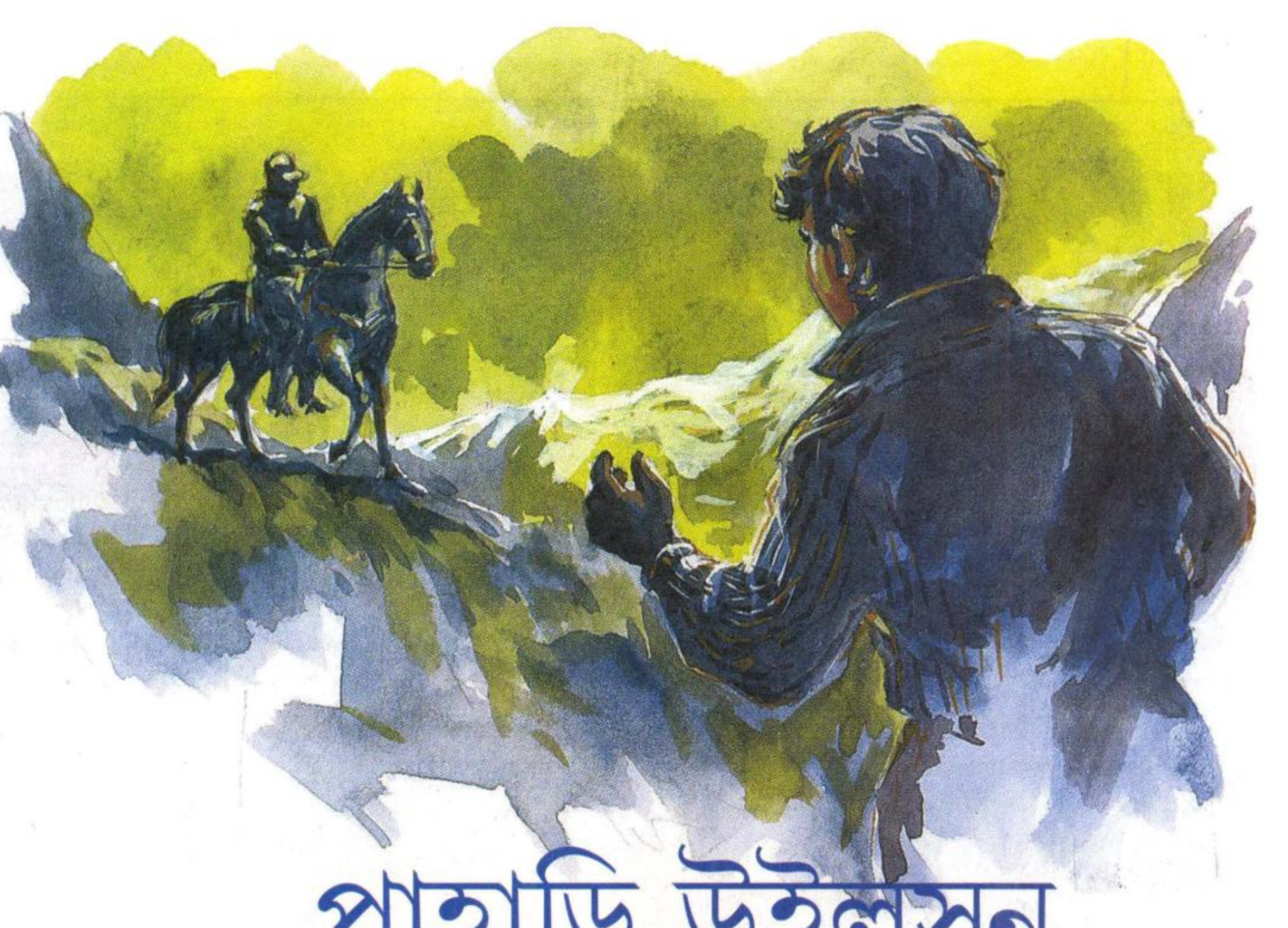

পাহাড়ি উইলসন

ইন্দ্রনীল সান্যাল

বাঁ দিকের বাটন দাবাও, বুম! উড়ে গেল শত্রুপক্ষের লোকালয়। ডান দিকের বাটন দাবাও, আবার বুম! উড়ে গেল একটা হাসপাতাল। ফরোয়ার্ড বাটন দাবাও, এগোও, এগোও... বিপক্ষ ঝপাঝপ বানিয়ে ফেলছে নতুন-নতুন অস্ত্র কারখানা। সেখানে তৈরি হচ্ছে মিসাইল, রকেট, গ্রেনেড, রকেট লঞ্চার, সুইসাইড-বম্বার। ডাইনে চলো, বুম বুম! বাঁয়ে চলো, বুম বুম বুম! আগে বাড়ো, ছোড়ো রকেট, বুম বুম বুম বুম! স্কোর বাড়ছে, বাড়ছে... হঠাৎই বিপক্ষের ছোড়া স্মোক বম্বের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পুরো স্ক্রিন। তার মধ্যে থেকে একটা বাজুকা হাতে সাক্ষাৎ যমের মতো বেরিয়ে এল একটা সাইবারনেটিক অর্গানিজ়ম বা সাইবর্গ। সরাসরি রুরুর দিকে বাজুকা তাক করল সে। গাম্‌ম্‌ম...!

'গেম ওভার। ইউ লস্ট। স্কোর, জিরো:ওয়ান। রিজ়িউম নিউ গেম অর কুইট?' ভিডিওগেমিং কনসোলের স্ক্রিনের নিউ গেম অপশনে গিয়ে ক্লিক করল রুরু। এবার পরের খেলা। হঠাৎই বসার ঘরে টিভি দেখতে থাকা মায়ের গলা শোনা গেল, "রুরু, খেতে এসো।"

"রুরু, খাবে না?"

"বো।"

"রুরু, হোমটাস্ক কমপ্লিট?"

"প্লিট।"

"ম্যাথ্‌স রেডি? বাংলা ডেফিনিশন মুখস্থ?"

"স্থ।"

"বলো তো, অচেনার আনন্দ বলতে কী বোঝো?"

বাটনের দাপটে ফাইটার প্লেন ডাইনে-বাঁয়ে উড়ছে, আগুপিছু করছে বিশাল চেহারার কামান, দমাদ্দম বোমার ঘায়ে ভেঙে যাচ্ছে ব্যারিকেড, অস্ত্রশস্ত্র, বাঙ্কার ও হেলিপ্যাড, লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লের প্রতিটি পিক্সেল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ভিডিওগেমের ওয়র ক্রাই... বুম বুম বুম বুম!

'কনগ্র্যাচুলেশন্‌স। ইউ ওন। স্কোর-ওয়ান:ওয়ান। রিজ়িউম নিউ গেম অর কুইট?' রুরুর ঘাম গড়াচ্ছে, হার্টবিট যেন পি টি উষা। রুরু উত্তর দিল, "অনধিগত সত্যের সন্ধান লাভ করে, নবীনতার আস্বাদনের মধ্য দিয়ে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির চরিতার্থতায়, আত্মোপলব্ধির যে রসগোল্লা, তাই অচেনার আনন্দ।"

টিভি দেখতে-দেখতে হাসিতে ফেটে পড়লেন রুরুর বাবা, "ওরে কাউচ পোট্যাটো। ওটা রসগোল্লা নয়, রসোল্লাস। আত্মোপলব্ধির রসোল্লাস। নিজের জানার আনন্দ। ব্যায়াম না করে, জাঙ্ক ফুড খেয়ে আর ভিডিও গেম্‌স খেলে গত তিন বছরে তোমার তেরো কেজি ওজন বেড়েছে। এর পরে প্রশ্নের উত্তরে রসগোল্লা লিখলে, নম্বরেও রসগোল্লাই আসবে। বুঝলে ভিডিয়ট?"

"লাম।"

রুরু অপশনে গিয়ে নিউ গেমে ক্লিক

করল।

এই সেই সময়! যখন রুরুর মা চোখ গোলগোল করে, মুখটা অল্প খুলে, ঘাড়টা এক দিকে বাঁকিয়ে টেলিভিশনের পরদার দিকে তাকিয়ে থাকবেন। আর থেকে-থেকেই বলে উঠবেন, "এম্‌মা! শাশুড়িটা আবার কোমায় চলে গেল?" কিংবা, "যাঃ! মেজোবউটার মুখেও প্লাস্টিক সার্জারি হল?" কিংবা, "হায় হায়! তৃতীয় পক্ষের বরটাও গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেল?" কেবল বিজ্ঞাপনের বিরতির সময় খুবই বিরক্তির সঙ্গে, রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে রুরুর বাবাকে খেলা কিংবা খবরের চ্যানেলটা কিছুক্ষণের জন্য দেখিয়ে দেবেন। তবে রিমোটটা হাতছাড়া করবেন না। কেননা, কে না জানে, রিমোট যার, টিভি তার।

এই সেই সময়! যখন রুরুর বাবা অফিস থেকে ফিরে, বড়কর্তার নিন্দে করতে-করতে জামাকাপড় পালটাবেন। তারপর ফুল-ফুল সিল্কের একটা লুঙ্গি পরে চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করবেন, "ওফ! খেটে-খেটে জান কয়লা হয়ে গেল। হ্যাঁ গো, এক কাপ কফি হবে নাকি?"

তারপর মায়ের তরফে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে টিভির সামনে বসে পড়বেন। আর থেকে-থেকেই ফুট কাটবেন, "ধুস! এই জন্যই দেশটার কিছু হল না।" কিংবা, "সত্যি, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো গোল্লায় গ্যাসে।" কিংবা, "ধ্যাত্তেরি, এই টিম নিয়ে ইন্ডিয়া জিতবে ওয়ার্ল্ড কাপ?"

অবশ্য তার আগে রুরুর ঘরে ঢুকে মোবাইল ফোনটা চার্জে দিয়ে, রুরুর ফোলা গাল দু'টো টিপে বলবেন, "হ্যাঁ রে মোটুরাম, হ্যাঁ রে কাউচ পোট্যাটো, হ্যাঁ রে রসগোল্লা, ফার্স্ট গ্রেড ওবেসিটিতে ভুগছিস। এবার একটু ব্যায়ামফ্যায়াম কর।"

এই সেই সময়! যাকে টেলিভিশনের ভাষায়, ইংরেজিতে, 'প্রাইম টাইম' বলা হয়।

যখন রুরু বাবা-মা'র যাবতীয় দুষ্টুমি সহ্য করবে। বদলে নিজেও নানারকম দুষ্টুমি করে যাবে। যেমন প্লে স্টেশনে ভিডিওগেম খেলতে-খেলতে এক বোতল কোলা সাবড়ে দেবে। মা'র কাছে রাত দু'টো পর্যন্ত টিভি দেখার পারমিশন আদায় করে নিতে-নিতে এবং ইন্টারনেট খুলে সাইবারস্পেসের বন্ধুর সঙ্গে চ্যাট করতে-করতে দু' প্যাকেট পোট্যাটো চিপ্‌স সাঁটিয়ে দেবে। বাবার মোবাইলে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' কলার টিউনটা বদলে 'ধুম মচালে ধুম' করে দিতে-দিতে, কিংবা মেসেজের ইনবক্সে গিয়ে জোক্‌সগুলো পড়ে হাসতে-হাসতে একটা বার্গার খেয়ে নেবে। হাসিটা অবশ্য জোক্‌সগুলো পড়ে নয়। ওগুলো তো রুরু জানেই। ওগুলো যে বাবাও জানেন, হাসিটা এই জন্য। এবং এই সব করতে-করতেই হিস্ট্রির 'সিপাহি বিদ্রোহের চ্যাপ্টার'টাও মুখস্থ করে নেবে। পরীক্ষায় ওটা আসছেই।

আজকের প্রাইম টাইমটা অবশ্য আলাদা। এবং ব্যাপক বোরিং। কেননা, সময়টা এক হলেও, লোকগুলো এক হলেও, জায়গাটা একদম আলাদা। এটা বাড়ি নয়, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের হোটেল। এটা পশ্চিমবাংলা নয়, উত্তরাঞ্চল। এটা কলকাতা নয়, ভৈরবঘাঁটি বা স্থানীয় উচ্চারণে ভৈরোঁঘাটি। কলকাতা থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ। সেখান থেকে ভাড়া করা অ্যাম্বাসাডারে চেপে গঙ্গোত্রী যেতে গিয়ে রাস্তায় ধসের খবর শুনে হরশিল উপত্যকায় আটকে পড়া। রাস্তা সারাতে দু' দিন লাগবে শুনে গাড়ি ঘুরিয়ে এই ভৈরোঁঘাটি। নাকের বদলে নরুন। গঙ্গোত্রীর বদলে ভৈরোঁঘাটি।

ফল হিসেবে বাবা ল্যাগব্যাগার্নিসের মুখোশ পরে নিয়েছেন। আর মা গোমড়াথেরিয়ামের। ছেলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর চার ধাম বেড়াতে বেরিয়ে মাঝরাস্তায় আটকে পড়তে কারই বা ভাল লাগে! রুরুও চুপচাপ। কেননা, তার চার ধাম — ইন্টারনেট, গেমিং কনসোল, মোবাইল বা টিভি, কোনওটাই হাতের নাগালে নেই। প্রথম দু'টো তো এই ভূতেপাওয়া জায়গায় ভুলে যাওয়াই ভাল। মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। আর টিভিটা রোজকার মতো মা-বাবার দখলে।

বিকেলে তিনজনে চড়াইয়ের রাস্তা ধরে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। আকাশের রং 'মেরাওয়ালা ব্লু'। মাঝেমধ্যে স্থানীয় মানুষেরা ঘোড়া বা খচ্চরে চড়ে যাচ্ছে। ছোটরা যাচ্ছে টাট্টু ঘোড়া বা পনিতে। পরনে ধুতি-কামিজ। পায়ে মোচড়ি বা চামড়ার নাগরা।

"বাবা, ওটা কী পাখি?" প্রশ্ন করল রুরু।

গাছের ডালে একটা কালো রঙের পাখি বসে। কাকের মতোই দেখতে, কিন্তু ঠোঁটটা হলদেটে। বাবা একগাল হেসে বললেন, "ওরে রসগোল্লা, ওটা কাক। স্থানীয় লোকদের ভাষায় 'চো'। এরা পাখিটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে। আমিও সকালে দেখে চিনতে পারিনি। চৌকিদার গোপাল দুবেকে জিজ্ঞেস করতে, ও-ই আমাকে এই কথা বলল।"

বাঁ দিকে অনেক নীচে ভাগীরথী নদীর থেকে ভাগ হয়ে গিয়েছে তার শাখা জড়গঙ্গা। সেখান থেকে উঠে আসছে থোকা-থোকা সাদা কুয়াশা। মা শালটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বললেন, "তুমি বাপু অলক্ষুনে কথা বোলো না তো! চলো, হোটেলে ফিরি।"

রুরু মোটাসোটা চেহারাটা নিয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। কোনও রকমে থপথপ করে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "চৌকিদার গোপাল আঙ্কল বলেছিল, হোটেল থেকে উতরাই রাস্তায় একটা বুড়ি নাকি সন্ধেবেলা জিলিপি ভাজে। দুধে ডুবিয়ে খেতে হয়। আমরা খাব না?"

বাবা কিছু বলার আগেই মায়ের কড়া গলার উত্তর শোনা গেল, "গোপাল এও বলেছে যে, এখানে কী একটা সাহেব ভূত আছে। রাত্তিরে সে নাকি ঘোড়ায় চড়ে চার দিকে পাহারা দেয়। সন্ধের পর কোথাও যাওয়া যাবে না।"

শুনে রুরুর বেদম হাসি পেল। ভূতের পাহারা তো ভাল জিনিস। মা মিষ্টি খেতে না দেওয়ার জন্য অন্য কোনও অজুহাত দিতে পারতেন।

বড়রা খুব বেশি বদলান না। ডিনারের পরে বাবা আর মা টিভির রিমোট নিয়ে ঠান্ডা লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ফাঁকে নীল জিনসের উপর নীল পুলওভার পরে একটা দশ টাকার নোট নিয়ে রুরু হোটেল থেকে বেরোল। বিকেলে যে রাস্তা ধরে গিয়েছিল, তার উলটো দিকে উতরাই বরাবর হেঁটে, নেমে এল অনেকটা নীচে। হ্যাঁ, গোপাল আঙ্কেলের কথামতো দোকানটা সত্যিই আছে। রুরু ছ'টা জিলিপি আর এক ভাঁড় দুধ খেল। এক

গাল ফোকলা হাসি হেসে বুড়ি একটা শতছিন্ন এক টাকার নোট ফেরত দিল। টাকাটা নিয়ে রুরু চড়াইয়ের পথ ধরল।

হঠাৎই একটা অজানা গুড়গুড় শব্দে চমকে উঠল রুরু। শব্দটা অনেক উপরে পাহাড়ের গা বেয়ে আসছে। কীসের আওয়াজ কে জানে বাবা! রুরু জোর কদমে হাঁটতে লাগাল। বাবা-মাকে লুকিয়ে এই লুভিষ্টিরগিরি ঠিক হয়নি। বিকেলে দেখা কাকটার কথা মনে পড়ে গেল রুরুর। মনে পড়ে গেল বাবার বলা কুসংস্কারের কথাটাও। মৃদু গুড়গুড় আওয়াজটা হোম থিয়েটারের কায়দায় চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। উপর থেকে নীচের দিকে নেমেও আসছে খুব তাড়াতাড়ি। রুরু দৌড় লাগাল। একে জাঙ্কফুড খাওয়া, ব্যায়াম না করা চর্বিতে থলথলে শরীর; তার সঙ্গে চড়াই বরাবর দৌড়। রুরু যেন আর পারে না। হোটেল থেকে কতটা দূর এসেছিল সে? কতটা? পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে, গুড়গুড় আওয়াজটা বদলে গুমগুম হয়ে যাচ্ছে, টুপটাপ ধুপধাপ করে উপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ছোট থেকে মেজো থেকে বড় সাইজের নুড়ি পাথর ও বোল্ডার... রুরু দৌড়য়। আর দু'টো বাঁক? তারপরে, হোটেলের আলো দেখা যাবে কি?

অকস্মাৎ পাহাড়, রাস্তা, উপত্যকা, গাছপালা, আকাশ সবকিছু এক ধাক্কায় ভাসিয়ে দিল একটা সর্বস্বপ্লাবী জলস্রোত। ধসের কারণে গতিপথ বদলে যাওয়ায়, ধরিত্রীর পেট চিরে উঠে আসা জলের তোড়ের আদিম উচ্ছ্বাসে, হড়কা বানের স্রোতে, সব কিছু ভেসে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সঙ্গে রুরুও।

"মা গো!" কারও একটা শক্ত হাতের চাপ একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বারবার বুকে আঘাত করছে। আর ছন্দ মিলিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ভলভল করে বেরিয়ে আসছে পেঁকো, লোনা জল। কষ্টে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, "মা গো!"

"সিম্‌স টু বি ফ্রম বেঙ্গল।" যে চওড়া সাদা হাত দু'টো এতক্ষণ রুরুর বুক থাবড়ে জল বের করছিল, তার মালিক কথাটা বলল। প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা শীর্ণ চেহারার এক সাহেব। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। পরনে ডার্ক ট্যান রঙের রাইডিং জ্যাকেট, দুধসাদা ব্রিচেস বা ঘোড়ায় চড়ার চোঙা প্যান্ট, কালো চামড়ার রাইডিং বুট। মাথায় একটা কালো বোলার হ্যাট। সাহেবের চেহারা দেখে সম্ভ্রম জাগে। পাশে দাঁড়িয়ে একটা খয়েরি রঙের আরবি ঘোড়া। এদিকের কড়া রোদ্দুরে সাহেবের গায়ের রং যে কয়েক পোঁচ কালো হয়ে গিয়েছে, তা এই জ্যোৎস্না রাতেও বোঝা যাচ্ছে। কাশতে-কাশতে ঘাড় নেড়ে রুরু হ্যাঁ বলল।

"আই নো বেঙ্গলি। তোমার নাম কী?"

রুরু নাম বলতেই সাহেব বলল, "স্ট্রেঞ্জ নেম! এনি ওয়ে, কাম উইথ মি।" তারপর রুরুর বিশাল চেহারাটা এক ঝটকায় ঘোড়ার পিঠে তুলে রেকাবে এক পা দিয়ে তড়াক করে স্যাডলে উঠে বসল। লাগামে টান পড়তেই নাক দিয়ে ফরর্‌র শব্দ করে ঘোড়াটা চলতে শুরু করল।

চাঁদের আলো আর জমাট কুয়াশার লুকোচুরির মধ্যে রুরুর সামনে ফুটে উঠল অপার্থিব একটা দৃশ্য। খাদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত, দড়ি আর কাঠ দিয়ে তৈরি একটা ঝুলন্ত সেতু। রুরু জানে এগুলোকে সাসপেনশন ব্রিজ বলে। চাঁদ ও কুয়াশা, আলো ও আঁধার, এপার আর ওপারের মধ্যে বিছিয়ে থাকা সেই সেতুতে ঘোড়াটা প্রথম কদম ফেলতেই দুলে উঠল পুরো সেতু। খট। দ্বিতীয় কদম পড়তেই দুলুনিটা বাড়ল। খট। দড়ি আর কাঠের গ্রন্থি থেকে প্রতিবাদ ভেসে এল, ক্যাঁচ, ক্যাঁচ, ক্যাঁচ-খট খট খট...। ভয়ে কেঁপে উঠে রুরু সাহেবের লাগাম ধরা হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করল, "তো-তো-তোমার নাম কী?"

"ফ্রেডরিক ই উইলসন। প্রাক্তন অফিসার, থার্টি ফোর্থ ইনফ্যান্ট্রি, ব্যারাকপুর। যেখানে ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল মঙ্গল পান্ডেকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়।" রুরুর কানে ফিসফিস করে বলতে থাকে উইলসন সাহেব, "আমি বরাবরই নেটিভদের পক্ষে ছিলাম। ব্যারাকপুরের এক মহিলাকে আমি বিবাহও করি। ওর নাম গোলাপি। ওখানে আমার পাংখাপুলার ছিল গোপাল দাস আর সহিস ছিল লছমন দুবে। মিউটিনি শুরু হওয়ার পরপরই গোপাল আর দুবের সঙ্গে আমি আর গোলাপি ট্রেনে করে রানিগঞ্জ পালিয়ে আসি। ১৮৫৪ সালেই হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কাজ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে হেঁটে, গোরুর গাড়িতে, আরও নানারকমভাবে আমরা পৌঁছই গাড়োয়াল রেঞ্জের তেহরিতে। তেহরির রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগত। আশ্রয় তো দিলেনই না, উলটে কোম্পানিকে খবর দিয়ে দিলেন। আমরা তখন প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এলাম এই হরশিলে, জঙ্গলের মধ্যে। কাঠের ব্যবসা শুরু করলাম। কিছু দিন পরে টাকাপয়সা জমলে একটা বাড়িও করলাম। এখানকার লোকেরা খুব গরিব। ওদের জন্য রাস্তাঘাট বানিয়ে দিলাম। ওরা তাই আমাকে খুব মানে। বলে 'রাজা উইলসন'। আমার স্ত্রীকে বলে 'গুলাবি ঠাকুরাইন'। আমি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই বলে কেউ-কেউ আড়ালে আমাকে 'পাহাড়ি উইলসন' বলেও ডাকে। এই সাসপেনশন ব্রিজটাও আমার নকশায় তৈরি। ওরা প্রথম-প্রথম এই ব্রিজ পেরোতে ভয় পেত। আমিই ঘোড়ায় চড়ে বারবার এপার ওপার করে ওদের ভয় কাটিয়েছি।"

রাজা উইলসনের এত গল্পের মধ্যে রুরু টেরও পায়নি কখন যেন সেতুটা শেষ হয়ে এসেছে। অন্য প্রান্তে কুয়াশার মধ্যে লালটেন হাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। পরনে স্থানীয় পোশাক। হাতে সড়কি আর লাঠি। রাজা চিৎকার করে বলল, "হুকুমদার?"

শব্দটা পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে-হতে মিলিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন বিনীত কণ্ঠে বলল, "দুবে হুজৌর।"

এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে রুরুকেও ঘোড়া থেকে নামাল রাজা। দুবে ঘোড়াটা নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। অন্য একজনের হাতে রুরুকে সঁপে দিয়ে রাজা বলল, "গোপাল, একে সাফসুতরো করে ডাইনিংরুমে নিয়ে এসো। বেচারি ঠান্ডায় কাঁপছে।"

গোপাল নামের মানুষটি রুরুকে কোলে নিয়ে একটা কম্বল জড়িয়ে ধরল। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "তুমি বাঙালি? আমিও বাঙালি। আমার নাম গোপাল দাস। তুমি আমাকে 'গোপালদাদা' বলে ডেকো।"

বাড়ি তো নয় প্রাসাদ। নাম 'ফ্রেডরিক ম্যানসন'। কাঠের বিশাল দরজা ঠেলে

ভিতরে ঢুকল দু'জনে। তারপর কার্পেটে মোড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় পৌঁছল। দোতলায় মোট চোদ্দোটা শোওয়ার ঘর। সেখানকারই একটা ঘরে গোপালদাদা রুরুর ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে গা-মাথা ভাল করে মুছে নতুন ধোতি-কামিজ পরিয়ে পায়ে মোচড়ি গলিয়ে একতলায় নিয়ে এল। অন্য একটা ঘরে গুলাবি ঠাকুরাইন ছোটদের ধমকাচ্ছিলেন। রুরু আন্দাজ করতে পারল, তার পরনের পোশাকগুলো কার। একতলার খাবারঘরেই রাজার সঙ্গে আবারও দেখা হল। রোজ়উড কাঠের বিশাল ডাইনিংটেবিলে এলাহি আয়োজন। ভারতীয় ডাল-চাওল ছাড়াও সাহেবি খাবার বলতে আইরিশ স্টু, ডেভিল্ড কিড্‌নি, এই সব রয়েছে। সব কিছুই গোগ্রাসে খেল রুরু। তার খাওয়া খর চোখে দেখে নিয়ে রাজা বলল, "গোপাল, ওকে শুইয়ে দাও। আর কাল ভোরে আখড়ায় নিয়ে এসো।"

বিশাল ফোর-পোস্টার খাটে ঘুমিয়ে পড়ার আগে রুরু প্রশ্ন করল, "গোপালদাদা, আখড়া কী?"

গোপালদাদা মুচকি হেসে বলল, "কুস্তির আখড়া। কাল ভোরেই দেখতে পাবে।"

সূর্য ওঠার আগেই রুরুকে টেনে তুলল গোপালদাদা। তারপর রুরুর শত আপত্তি সত্ত্বেও একটা লাল ছোট প্যান্ট পরিয়ে প্রাসাদের পিছনে গাছের আড়ালে আখড়ায় নিয়ে গেল। গাড়োয়ালি ছেলের দল লাল প্যান্ট পরে বৃত্তাকার দাঁড়িয়ে। কারওরই শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই। ঠিক যেখানে যেটুকু পেশি দিলে ভাস্কর্য নিখুঁত হয়, প্রত্যেকেরই সেরকম চেহারা। নিজের গালে, বুকে, পেটে, কোমরে, থাইয়ে চর্বির দুলুনি অনুভব করে রুরু লজ্জা পেয়ে গেল। অবশ্য পালোয়ানরা কেউই রুরুকে ঘুরেও দেখল না। কেননা, তারা দেখছে একটা কুস্তি। রাজা উইলসনের সঙ্গে সহিস দুবের। ত্বকের রঙের ব্যবধান মুছিয়ে দিয়েছে ভৈরোঁঘাটির মিহিন ধুলো। কে সাহেব আর কে নেটিভ, তা বোঝাই যাচ্ছে না। মিনিট তিনেকের ধুলো উড়নো কুস্তির শেষে ধোবি প্যাঁচে দুবে রাজাকে হারিয়ে দিল। সবাই ফটাফট হাততালি দিতে লাগল। কুস্তির শেষে ধূলিধূসরিত রাজা, গভীর নীল চোখ দিয়ে ভাল করে দেখল রুরুকে। তারপর বলল, "রসগুল্লা ফ্রম বেঙ্গল!"

কথাটার মধ্যে তীব্র হুল ছিল। রুরু চোখ নামিয়ে নিল। রাজা রুরুর কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বলল, "আই উইল ট্রেন দিস চাইল্ড।"

ব্যস, শুরু হয়ে গেল। রোজ ভোরবেলা প্রথমে দৌড়। তারপর আখড়ার মাটি কপালে লেপে মুগুর ভাঁজা, ডন-বৈঠক দেওয়া। প্রথম-প্রথম কষ্টে বুক ফেটে যেত। দশ পা দৌড়নোর পর ফুসফুসটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে মনে হত। দেখে পালোয়ানরা হাসত। ডন দেওয়ার সময় মনে হত, হাত দু'টো ছেঁড়া কাপড়ে তৈরি। আখড়ার মাটিতে চিবুক ঠুকে পড়লে রক্ত বেরিয়ে যেত। দেখে পালোয়ানরা আরও হাসত। বৈঠক দিতে গিয়ে পাঁচবারের মাথায় হাঁটু দু'টোকে মনে হত, ময়দার ড্যালা। রুরুর বসে পড়া দেখে হাসির হর্‌রায় ফেটে পড়ত পালোয়ানরা। রুরুর চোখ দিয়ে জল পড়ত টপটপ করে। কিন্তু রাজার গায়ে ছ্যাঁকা ধরানো, "কাম অন রসগুল্লা! ট্রাই এগেন!"

শুনে কোথা থেকে যেন শরীরে আসত নতুন উদ্যম। কারওর তোয়াক্কা না করে রুরু শুরু করত ডন দেওয়া। থুতনি থেকে ঘাম ঝরলে আখড়ার ঝুরো মাটি শুষে নিত, শুধু লেগে থাকত লোনা দাগ। রুরু গুনত পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ...।

বিকেলবেলায় হর্সরাইডিং। পাক্কা অশ্বারোহীর ইউনিফর্ম পরে সাহেব বেরোত তার খয়েরি রঙের আরবি ঘোড়ায়। সঙ্গে রুরু, পনিতে। ট্রট, ক্যান্টার, গ্যালপ, ঘোড়ার এক-এক রকম চাল এক-এক দিন শেখাত রাজা। সঙ্গে চলত নানারকম মজার খেলা। যেমন রুরু একদিন বলল, "তাড়াতাড়ি বলো তো দেখি, 'লাল জল নীল নল'।"

টাং টুইস্টারটা বলতে গিয়ে সাহেবের জিভে গিঁট পড়ার জোগাড়! উলটে সাহেব বলল, "তুমি বলো তো, she sells sea-shells on sea-shore!" রুরু তো নাস্তানাবুদ। রেকাব, লাগাম, স্যাডল, এই সব সামলে দু'জনে পৌঁছত পাহাড় চূড়ায়। সেখানে একটু বিশ্রাম। দু'জনকে ঘিরে ধরত মুনাল পাখি আর পাহাড়ি ময়নার ঝাঁক। হঠাৎ করে দু'জনকে চমকে দিয়ে রাস্তা পেরোত আইবেক্স বা পাহাড়ি ছাগল। জ্যাকেটের পকেট থেকে ময়নাদের বাদাম ছুড়ে দিয়ে সাহেব বলত, "ওই দ্যাখো, ওই বাঁ দিকের পাহাড়টার নাম 'সুদর্শন পাহাড়'। আর ডান দিকেরটার নাম 'বান্দরপুঞ্ছ'। এই সব গাছ দেওদার আর পাইন। ধুপি বলে আর-একরকম গাছ আছে। আরও উঁচুতে হয়।" পথের ধারে অবহেলায় ফুটে থাকা গঙ্গাতুলসীর পাতা ছিঁড়ে রুরুর হাতে ধরিয়ে বলত, "শোঁকো, শুঁকলে শক্তি বাড়ে।"

পাহাড় চূড়া থেকে নীচের উপত্যকা খুব সুন্দর। পান্নার মতো সবুজ। অনেক নীচে স্থির নীল জল। দু' পাশে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট-ছোট্ট জনবসতি। পাহাড়ের গা কেটে ধাপে-ধাপে গড়ে তোলা চাষভূমি। সেখানে ধান, গম, অড়হর, ভুট্টা, রামদানার চাষ হচ্ছে। রামদানার হরেক রকম রং। সবুজ, হলুদ, মেরুন। সব মিলে হাতে আঁকা একটা ছবি। আস্তে-আস্তে নরম, হলুদ রোদ নামত পাহাড়চূড়ায়। দেওদার পাইনের পাতায় সেই রোদ ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াত। তারপর ঝরে পড়ত। রাজা আপন মনে বলত, "মাই বয়, জীবন খুব ছোট। অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে এই একটুখানি বর্তমান। একে ভালবাসতে শেখো। এমব্রেস লাইফ লাইক এনিথিং।"

ফেরার পথে পুরস্কার। এটা রাজার সঙ্গে একটা চুক্তি। রাজার এস্টেটের একটু দূরে একটা ছোট্ট দোকান। সেইখানে একজন খুনখুনে বুড়ি জালেবি ভাজে। পাশে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জড়গঙ্গা। সেই রসে টুসটুসে আড়াই প্যাঁচের জিলিপির দাম মেটাতে গিয়ে একদিন রুরুর তো চক্ষু ছানাবড়া। রাজাকে দেখতে পেয়ে সেদিন জালেবিনানি কিছুতেই দাম নেবে না। টাকা ফেরত দিয়ে দিল। টাকাটা হাতে নিয়ে রুরু দ্যাখে, সবুজ রঙের নোটটার এক দিকে রাজা উইলসনের মুখের ছবি, অন্য দিকে তার খাসতালুকের মানচিত্র। মাঝখানে জলছাপের মধ্যে লেখা 'ওয়ান রুপি'। তলায় টানা হাতের ইংরেজিতে সই 'ফ্রেডরিক ই উইলসন'। এক কোণে লেখা, 'সন ১৮৮৫'। রুরুর অবাক চোখ দেখে সাহেব বলল, "তুমি আগে খেয়াল করনি? আমার নিজস্ব টাঁকশাল আছে।

সেখানে আমার এস্টেটের নোট ছাপা হয়। ইউ কিপ ইট।" তারপর নোটটা রুরুর হাতে গুঁজে দিল।

আকাশে কুয়াশার চাদর। চাঁদের দেখা নেই। পাহাড়ি রাস্তায় দু' হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। রুরুর পনি, সাহেবের আরবি ঘোড়ার পিছন-পিছন আসছিল। হঠাৎই ডান দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে টকাটক করে নেমে এল একদল আইবেক্স। একেবারে পনি'র গায়ের উপর। ভয় পেয়ে পনিটা গা-ঝাড়া দিতেই রুরু পিঠ থেকে খসে পড়ল। রাজা সামনে থেকে চিৎকার করে উঠল, "ধরে থাকো, আয়্যাম কামিং!" পনির রেকাবে কিছুক্ষণ আটকে রইল রুরুর পা। তারপর মাধ্যাকর্ষণের টানে ছেড়ে গেল।

রাজা দৌড়ে এল। খাদের ধারের গাছের ডাল ধরে বাড়িয়ে দিল রুরুর দিকে। গঙ্গাতুলসীর গাছ আর কাঁটা ঝোপ দু' হাতে ধরে ঝুলতে থাকা রুরুও এক হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু অন্য হাত ছেড়ে যাওয়ায়, আঙুলে-আঙুল ছোঁয়ার দূরত্ব থেকে, পাহাড়ি উইলসনের চওড়া সাদা পাঞ্জাটা সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার ছাড়িয়ে ধীরে-ধীরে আলোকবর্ষের ওপারে চলে গেল।

হোটেল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে এবং পাঁচশো ফিট উপরে জড়গঙ্গার পারে রুরুর অজ্ঞান দেহটা উদ্ধার করে হোটেলের চৌকিদার গোপাল দুবে। আর্মি এবং উত্তরাঞ্চল পুলিশের যৌথ অভিযান চলাকালীন এবং হড়কা বান আসার আড়াই দিনের মাথায়। রুরুর পরনে ছিল একটা ময়লা সাদা চোঙাটে প্যান্ট। এই ষাট ঘণ্টা কলকাতা এবং জাতীয় স্তরের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ঘাঁটি ছিল ভৈরোঁঘাটি। কাঁদতে থাকা রুরুর মায়ের ছবি প্রতিটি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি চ্যানেলে কতবার যে দেখানো হয়েছে তা হিসেবের বাইরে। রুরু কি বেঁচে আছে? এই এস এম এস ভোটের বিচারে জীবিত রুরু পেয়েছে উনপঞ্চাশ শতাংশ; মৃত রুরু, উনপঞ্চাশ শতাংশ; এবং জানি না/বলতে পারব না, দুই শতাংশ। এই দুই শতাংশ কোন দিকে সুইং করবে এই নিয়ে রং পেনসিল কোম্পানি প্রযোজিত বিশেষ প্রতিবেদনে বক্তব্য রেখেছেন একজন শিশুচিকিৎসক, একজন শিশুমনস্তত্ত্ববিদ ও জনৈক শিশুসাহিত্যিক। রুরুর বাবাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে যে, 'ছেলেকে হারিয়ে আপনার কেমন লাগছে? রাত্তিরে ছেলে একা বেরিয়ে গেল, এটা কি আপনার গাফিলতি নয়?'

কিডিজ্ শু প্রযোজিত 'ওয়েটিং ফর রুরু' নামক রিয়্যালিটি শো'তে গ্রাফিক্স শিল্পী অ্যানিমেশনের মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, জোয়ার-ভাটার নিয়ম মেনে রুরুর দেহটা জড়গঙ্গার তীরে কত ফুট নীচে পাওয়া যাওয়া উচিত।

"কিন্তু সমস্ত নিয়ম ভেঙে, চ্যানেলগুলোর দর্শকসংখ্যা আড়াই দিনের জন্য বাড়িয়ে, রুরু বেঁচে ফিরে এল, যেদিকে হড়কা বান এসেছিল তার উলটো দিকে। হোটেল থেকে পাঁচশো ফিট উপরে চড়াই রাস্তায়। ক্যামেরার সামনে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া উন্নততর কোনও পারফরম্যান্স রুরু দিতে পারেনি। কেননা, সে নিজে ১৮৮৫ সালের ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছিল, নাকি ইতিহাসের পাতা থেকে ১৮৮৫ সালটাই চলে এসেছিল তার কাছে, নাকি জলে ডুবে যাওয়ার কারণে পুরোটাই বিভ্রম, তা রুরুর চিন্তা-চেতনার বাইরে। তবে ক্যামেরার সামনে গোপাল দুবে অবশ্য জোর গলায় জানিয়েছে যে, "এই সবই পাহাড়ি উইলসন নামক সাহেব ভূতের কারসাজি। নেহি তো ও সফেদ প্যান্ট আয়া কাঁহাসে? বোলিয়ে? ও প্যান্ট বাবুয়াকা নেহি হ্যায়!" তবে এই গল্পটা পাবলিক খাবে না বলে মিডিয়া পাত্তা দেয়নি।

তারপর কেটে গিয়েছে আরও আট মাস।

এই সেই সময়, যখন রুরুর মা বিকেলে চান করে পাট ভাঙা শাড়ি পরে টি-পটে দু' কাপ চা বানিয়ে টিকোজি দিয়ে ঢেকে বারান্দায় একটা গল্পের বই নিয়ে বসবেন; আর বাতাসে ভেসে আসবে ভিজে গন্ধ। আর মা অন্য মনে বলবেন, "বোধ হয় বৃষ্টি আসবে, তোর বাবা এখনও এল না তো!"

এই সেই সময়, যখন রুরুর বাবা অফিস থেকে ফিরে চান করে একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে দু' কাপ চা ঢেলে রুরুর মায়ের পাশে বসবেন আর চালিয়ে দেবেন সাউন্ড সিস্টেম, যার থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্ষার মতো ছড়িয়ে পড়বে সারা বাড়ি। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'। অবশ্য তার আগে রুরুর ঘরে ঢুকে মোবাইলটা চার্জে দিয়ে রুরুর চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলবেন, "কী রে ব্যাটা, আজ কতক্ষণ রাইডিং করলি?"

এই সেই সময়, যখন পড়াশোনার ফাঁকে রুরু প্লে স্টেশনে বসে গেমিং করে নেবে। অথবা মোবাইলের 'ধুম মচালে ধুম' কলার টিউনটা বদলে 'পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে-হতে... বোকা বাক্সতে বন্দি' করে দেবে। অথবা সাইবার বন্ধুর সঙ্গে চ্যাট করে নেবে। আর হঠাৎ-হঠাৎ পোট্যাটো চিপ্‌স, কোলা, বার্গার, আইসক্রিমের দিকে মন গেলে ড্রয়ারের কোণ থেকে বের করে আনবে একটা এক টাকার নোট। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভৈরোঁঘাটির টাঁকশালে তৈরি হওয়া একশো কুড়ি বছরেরও পুরনো নোটটি আবহাওয়ার প্রহারে জর্জরিত। কিন্তু তাও দেখা যাচ্ছে সবুজ রঙের নোটটার এক দিকে পাহাড়ি উইলসনের মুখের ছবি, অন্য দিকে তার খাসতালুকের মানচিত্র। মাঝখানে জলছাপের মধ্যে লেখা 'ওয়ান রুপি'। তলায় টানা হাতের ইংরেজিতে সই ফ্রেডরিক ই উইলসন।

বাইরে ঝরঝরে বর্ষা, রুরুর চার দিকে ঝরে পড়ে। রুরু দেখতে পায় কাঠের আর দড়ির তৈরি একটা লম্বা ঝুলন্ত সেতু... সেটা তৎকালীন হিমাচলপ্রদেশ থেকে এখনকার পশ্চিমবাংলা, ভৈরোঁঘাটি থেকে কলকাতা, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত... আর তার উপর দিয়ে খয়েরি রঙের আরবি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ি উইলসন সেতুটা পেরোচ্ছে। সেতুটা দুলছে ...কিন্তু গাঁওয়ালোর যাবতীয় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ি উইলসন আসছে... আর চিৎকার করছে... "কাম অন রসগুল্লা, ট্রাই এগেন!"

রুরুর শরীর কাঁপিয়ে বয়ে গেল গাড়োয়ালি হাওয়া। কানে এল পাহাড়ি উইলসনের ঘোড়ার খুরের শব্দ, খট-খট-খট...। টাকাটা সন্তর্পণে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রুরু পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠল। তারপর রান্নাঘরের দিকে না গিয়ে পড়ার ঘরের মেঝেয় শুয়ে ডন দিতে থাকল। পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন...

বাইরে, তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বই-বই গন্ধটা এখনও বাতাসে ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি শেষ হল কলকাতা বইমেলা। এবারের কুইজের বিষয়ও তাই বই এবং বইমেলা।

কুইজ়

১ এখন বইমেলার 'থিম' বিভিন্ন দেশ হলেও ১৯৯১ সালে কলকাতা বইমেলার প্রথম 'থিম' কী ছিল?

২ প্রথম কোন লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি টাইপ করে প্রকাশকের কাছে জমা দেন? বইটির নাম কী ?

৩ বেচা-কেনার হিসেবে বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলা কোনটি?

৪ ১৮৫২ সালের ২০ মার্চ প্রকাশিত কোন বই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছিল?

৫ কলকাতা বইমেলার প্রথম আন্তর্জাতিক 'থিম' ছিল ফ্রান্স। ১৯৯৭ সালে কোন ফরাসি দার্শনিক বইমেলার উদ্বোধন করতে এসেছিলেন?

৬ শেক্সপিয়রের লেখা চারটি নাটকে ভূতের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দু'টো হল 'জুলিয়াস সিজ়ার' এবং 'রিচার্ড থ্রি'। বলতে পার বাকি দু'টো বইয়ের নাম কী?

৭ লন্ডনে ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় এই লেখক তাঁর বই-এর ইংরেজি অনুবাদ হারিয়ে ফেলেছিলেন। রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পরে বাক্সটি ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। পরের বছর সেই বইয়ের জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কে ছিলেন এই বিখ্যাত লেখক?

৮ "টেলিভিশনকে একদিক থেকে আমার শিক্ষামূলক মনে হয়। যখনই কেউ টিভি চালায়, আমি অন্য ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসে যাই।" বই-এর গুণ গেয়ে এই মজার মন্তব্যটি করেছিলেন কে?

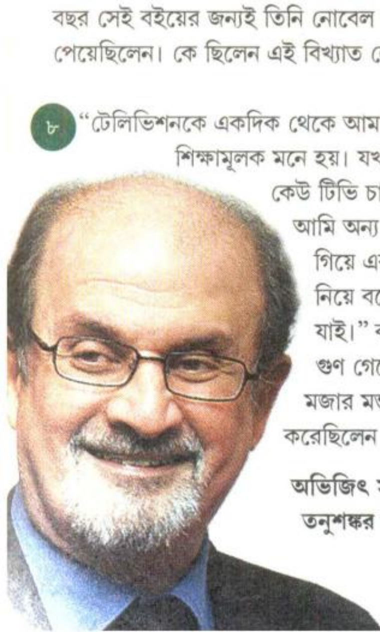

অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

গত সংখ্যার উত্তর

১.'কভি আজনবি থে'।

২. সে সময় ইংল্যান্ডে রবিবার ক্রিকেট খেলা হত না।

৩. অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও হেনরি ওলোঙ্গা।

৪. রমজান মাস শেষ হওয়ার পর খেলতে নামে পাকিস্তান।

৫. দক্ষিণ আফ্রিকা।

৬. ডন প্রিঙ্গল (১৯৭৫, পূর্ব আফ্রিকা) ও ডেরেক প্রিঙ্গল (১৯৮৭ ও ১৯৯২, ইংল্যান্ড)।

৭.এস ভেঙ্কটরাঘবন।

৮. চামিন্ডা ভাস (বাংলাদেশের বিপক্ষে) এবং ব্রেট লি (কিনিয়ার বিরুদ্ধে)।

জবাব চাই

১. গুটেনবার্গ ছাপাখানায় প্রথম যে বইটি ছাপা হয়েছিল তার নাম কী?

২. দক্ষিণ আফ্রিকার কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনীর নাম 'আ লং ওয়াক টু ফ্রিডম'?

৩.'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি লিখে মুসলিম মৌলবাদীদের ফতোয়ার মুখে পড়েছিলেন কোন বিখ্যাত লেখক?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১.কিনিয়া ও জিম্বাবোয়ে ২. আশিস নেহরা

৩. জাভেদ মিয়াঁদাদ

সঠিক উত্তরদাতা

গোপা চট্টোপাধ্যায়, দশম শ্রেণি, তালড্যাঙরা বালিকা বিদ্যালয়, বাঁকুড়া; **শুভদীপ বিশ্বাস,** বারাসাত গভর্নমেন্ট হাই স্কুল; **দীপন পুশিলাল,** দশম শ্রেণি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউশন, কলকাতা; **সৈকত ঘোষ,** অষ্টম শ্রেণি, নারকেলডাঙা হাই স্কুল, কলকাতা; **অর্ণব দাস,** হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, হুগলি; **স্পন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব দাস, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুনাল রঞ্জন, সন্দীপন মাঝি,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **শ্রীজিতা সাহা,** পঞ্চম শ্রেণি, ডাফ স্কুল, কলকাতা; **নীলাঞ্জন ঘোষ,** পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর; **অনির্বাণ মাহাতো, অর্জুন মাহাতো, সৌনাভ ঘোষ,** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **শিল্পা দাস,** একাদশ শ্রেণি, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা; **কৌস্তভ নন্দী, কৌস্তভ দাস, শাশ্বত মণ্ডল, শ্যামসুন্দর পাঁজা, সুময় বেরা, শ্রীমন্তলাল মাহাত, অনির্বাণ ঘোষ, অর্জুন চট্টোপাধ্যায়, দেবর্ষি গোস্বামী, ঐশিক বন্দ্যোপাধ্যায়,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **ময়ূখ ভট্টাচার্য,** ষষ্ঠ শ্রেণি, উত্তরপাড়া চিলড্রেন্স ওন হোম, হুগলি; **অভিজিৎ চৌধুরী,** অষ্টম শ্রেণি, বেড়চাঁপা দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়; **দীপ্তাংশু মণ্ডল,** নবম শ্রেণি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

ইনস্টিটিউশন, কলকাতা; **কিংশুক দাস,** পঞ্চম শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, হুগলি; **অর্ণব বিশ্বাস, অর্জুন মাহাতো, অর্পণ হোড়, সুময় ঘোষ, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

পাখি এবার বিক্রমগড়ে

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

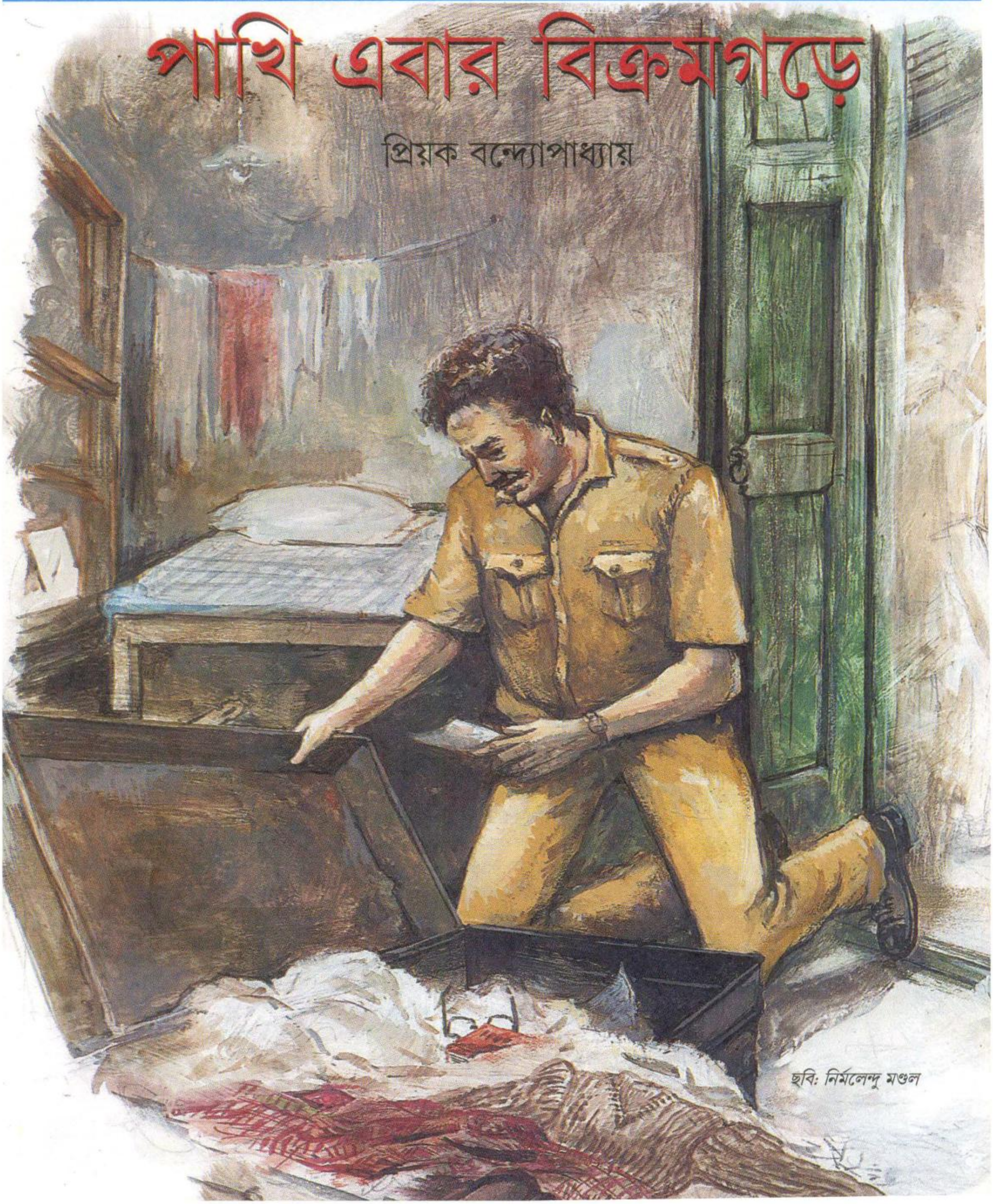

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

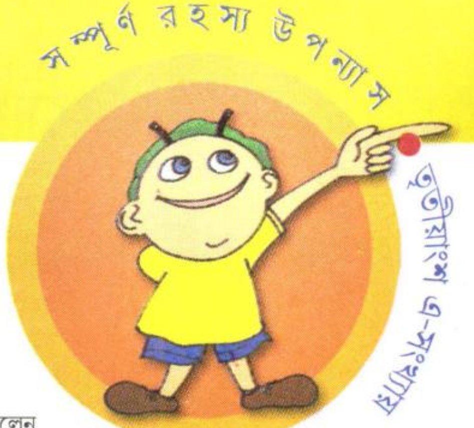

আগে যা ঘটেছে: *হস্টেল থেকে পাখি গেল বিক্রমগড়ে জিনিয়াদের বাড়ি, সঙ্গে জিনিয়া। ওর দাদু সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। এখানে বাড়ি করেছেন। একদিন তাঁর ব্যবসার আশি হাজার টাকার চেক কেউ ভাঙিয়ে নিল। তারপর খুন হলেন জিনিয়ার দাদু ব্রজেন দত্ত। কে খুন করল তাঁকে? দারোগা শিবপ্রসাদ সমাদ্দার এলেন তদন্তের কাজে। রহস্যের খোঁজে পাখিও কৌতূহলী হয়ে উঠল। দাদুর স্টাডিরুম থেকে একটা ডায়েরি বগলদাবা করে সমাদ্দারদারোগা গেলেন সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টের অফিসে। কী ঘটল তারপর...?*

॥ ১৪ ॥

সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টের অফিসে চেয়ারে বসে গরম কফিতে চুমুক দিতে-দিতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চারপাশটা দেখছিলেন সমাদ্দারদারোগা।

ফাইলের পাহাড় থেকে মুখ তুলে মিহির দত্ত বললেন, "আমার পি এ চন্দনকে বলে রেখেছি, যেসব কাগজপত্র দেখতে চাইবেন, সবই দেখিয়ে দেবে। ছোকরা খুবই এফিশিয়েন্ট, ফলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"

"হিসেবের খাতাপত্তরে কি খোয়া যাওয়া চেকটার কথাও থাকবে মিহিরবাবু?" মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সমাদ্দারদারোগা।

নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিহির দত্তর মুখ। পলকহীন চোখে ফিসফিস করে বললেন, "আপনি জানলেন কী করে? আমি তো কাউকে বলিনি ব্যাপারটা।"

"সব কথাই কি আর মুখে বলতে হয় মিহিরবাবু? হাওয়ায় তো কত কথাই ভেসে বেড়ায়, ধরতে জানতে হয়। আপনি হজম করে ফেললেই কথাটা আর কেউ জানতে পারবে না ভেবেছিলেন?"

"না, তা ঠিক নয়। আসলে পুরো ব্যাপারটাই এমন এম্ব্যারাসিং...।"

"ব্যাঙ্ককে ইনফর্ম করেননি আপনারা?"

"হ্যাঁ, করেছিলাম, তবে বেশ দেরিতে। কারণ, ব্যাপারটা ধরাই পড়েছিল দেরিতে। ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল। কী একটা কারণে চটজলদি পেমেন্টের দরকার হয়েছিল বলে বাবা নিবারণকাকাকে ওই লাখ টাকা, টু বি প্রিসাইজ, আশি হাজার টাকার চেকটা এন্‌ক্যাশ হয়েছে কি না ডেকে জিজ্ঞেস করতে নিবারণকাকা বললেন, চেকটা খুঁজে পাননি বলে জমাই দিতে পারেননি।"

"সাধারণত চেক-টেকগুলো রাখা হত কোথায়?"

"বাবার টেবিলের ড্রয়ারেই সাধারণত সব চেক রাখা থাকত। ড্রয়ারের চাবি কখনও বাবার কাছে, কখনও নিবারণকাকার কাছে থাকত।"

"নিবারণবাবুর কাছে চাবি? স্ট্রেঞ্জ!"

"আসলে নিবারণকাকা পুরনো বিশ্বাসী কর্মচারী। বাবাকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আমাদেরও খুবই স্নেহ করতেন। একেবারে নিজের বাড়ির লোকের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।" আমতা-আমতা করে সাফাই গাইলেন মিহিরবাবু।

"আরে রাখুন তো মশাই, আপনার নিজের বাড়ির লোক," রীতিমতো চিড়বিড়িয়ে উঠলেন সমাদ্দারদারোগা, "পাকা ক্রিমিনালরা যে কত উঁচুদরের অভিনেতা হয়, আপনাদের কোনও ধারণা আছে? এই জন্যই তো আমরা পইপই করে সব সময় বলি যে, বাড়ির কাজের লোকদের, সে একেবারে ম্যানেজার থেকে জমাদার পর্যন্ত সকলের ছবি, নাম, ঠিকানা রেখে দেবেন। তা কেউ কি শোনে আমাদের কথা। একেবারে গলায় ছুরি চালিয়ে যখন এরা পগারপার হয়, তখন আপনাদের টনক নড়ে।" পুলিশি ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকলেন মিহির দত্ত।

মিহিরবাবুর দুরবস্থায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পুলিশি জেরা অব্যাহত রাখলেন সমাদ্দারদারোগা, "চেক পাওয়া যাচ্ছে না বলে আপনারা যখন ব্যাঙ্ককে জানালেন, তখন ব্যাঙ্ক কী বলল?"

"ব্যাঙ্ক বলল, 'চেকটা অলরেডি এনক্যাশ্‌ড হয়ে গিয়েছে।' "

"বাঃ বাঃ, চমৎকার। কোনও সাবধানতা না নিয়েই অত বড় অ্যামাউন্টের চেকটা এনক্যাশ্‌ড করে দিল। তা ছাড়া আজকাল তো সাবধানের মার নেই বলে চেকের উপরে অ্যাকাউন্ট নম্বরও দেওয়া থাকে। আপনাদের চেকটায় ছিল না সেরকম কিছু?"

"আসলে ব্যবসা চালাতে গেলে সব টাকাই একটা অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে দেখলে তো আমাদেরই মুশকিল। তাই স্পেসিফিক কোনও অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া ছিল না। তবে এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কোনও দোষ ছিল না। এর আগেও এরকম বড় অ্যামাউন্টের চেক এনক্যাশ্‌ড হয়েছে। তবে দু'-তিন দিন সময় দিতে হত ব্যাঙ্ককে, এই যা।"

"একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "যে ব্যাটা আপনাদের চেক এনক্যাশ করেছিল, ব্যাঙ্ক কি তার চেহারার কোনও হদিশ দিতে পেরেছে?"

"প্রথমটায় পারেনি। পরে একজন ডিলিং ক্লার্ক অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিল, বেঁটেখাটো, দোহারা চেহারার এক ছোকরা চেকটা এনক্যাশ করেছিল।"

"হুঁ, ভারী বলেছে। যে-কোনও অ্যাভারেজ বাঙালি ছোকরারই ওইরকম চোখ জুড়নো চেহারা," মুখ বেঁকিয়ে হতাশ মুখে বললেন সমাদ্দারদারোগা, "বাংলার প্রায় সব জেলেই অন্তত এক ডজন করে এই চেহারার দাগি ক্রিমিনাল বসে আছে। কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে ধরব?"

কিছুক্ষণ দু' জনই চুপচাপ। মিহিরবাবুর কাচের টেবিলে রাখা ফুলছাপ পেপারওয়েটটা হাত দিয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে শিবপ্রসাদদারোগা বললেন, "বাই দ্য ওয়ে মিহিরবাবু, আপনার বাবার কোনও উইল আছে কি?"

"হ্যাঁ, তা আছে বইকি। গত বছর একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক

হওয়ার পর ভয় পেয়ে বাবা উইলটা করে ফেলেছিলেন। আমাদের কোম্পানির ল'ইয়ার উইলটা তৈরি করেছিলেন। উইটনেস হিসেবে রণবীরকাকা, ডক্টর সামন্ত আর নিবারণকাকা সই করেছিলেন।"

একটু নড়েচড়ে বসে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "উইলের মেন প্রভিশনগুলো কী ছিল শুনি একবার।"

"প্রথমত, বাবার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। সুধীর, সুকল্যাণ, জিনিয়া আর আমার নামে।"

"আর সানফ্লাওয়ারের মালিকানা?"

"বাবা যত দিন আছেন, তত দিন মালিক বলতে বাবা আর আমি। আর বাবার অবর্তমানে তার মালিকানার অংশ সমানভাবে ভাগ হবে সুকল্যাণ আর জিনিয়ার মধ্যে।"

"আর আপনার ভাই সুধীর? সানফ্লাওয়ারে তার কোনও জায়গা নেই।"

"না। উইলে স্পষ্ট করে বলা আছে, বহু ঘাম ঝরিয়ে, অনেক পরিশ্রম করে গড়ে তোলা সানফ্লাওয়ারের সঙ্গে সুধীরের কোনও রকম সম্পর্ক থাকবে না। তার পরিবর্তে পোলট্রি ফার্মের সমস্ত মালিকানা হবে সুধীরের। এই ফার্মের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এককালীন পঁচাত্তর হাজার টাকা আলাদা করে রাখা আছে এবং রণবীরকাকাকে সে বাবদ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া আছে।"

"উইলে আর কোনও উল্লেখযোগ্য শর্ত?"

"হ্যাঁ, তা আছে একটা। উইলে তরুদি আর নিবারণকাকার জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, পেনশন হিসেবে তরুদি আর নিবারণকাকা মাসে-মাসে তিন হাজার করে টাকা পাবেন।"

"নাও, বোঝো ঠ্যালা। এতক্ষণ নিবারণকাকা সিনে চমকাচ্ছিলেন। এবার তরুদিও ঢুকে পড়লেন। আপনার বাবা তো দেখছি রীতিমতো দানসত্র খুলে গিয়েছেন মশাই।" মুচকি হেসে বললেন সমাদ্দারদারোগা।

"না, আসলে তরুদি আর নিবারণকাকা তো বাবার অনেক দায়দায়িত্ব সামলাতেন।" সাফাই দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন মিহির দত্ত, "নিবারণকাকা বাইরের সব কাজ সামলাতেন আর বাবার খাওয়াদাওয়া, ওষুধপত্তর, এসবের ভার ছিল তরুদির উপর। তরুদি মানুষটিও যথেষ্ট ভদ্রঘরের। বাবাই এনেছিলেন তরুদিকে অনেক খুঁজেপেতে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার বললেন, "না, কাজ বাড়ল। এই তরুদিটিকেও একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা তো নেহাত হাতের ময়লা নয়!"

॥ ১৫ ॥

পুলিশ কথা বলতে এসেছে শুনেও তরুদির কোনও ভাবান্তর নেই। স্বাভাবিকভাবেই ঘুরেফিরে ঘরের কাজকর্ম সারছে। সকালের জলখাবারের টেবিল সাজাচ্ছে। শেষকালে মেজোকাকিমা জোর বকুনি দেওয়ায় তবে তরুদি নড়ল। পাখি আর জিনিয়াকে সঙ্গে করে একতলার ড্রয়িংরুমে সমাদ্দারদারোগার সামনে ইচ্ছে না থাকলেও এসে বসল।

"নন্দী-ভৃঙ্গি আজও হাজির!" চপল গলায় সমাদ্দারদারোগা পাখি আর জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন। তারপর তরুদির দিকে তাকিয়ে, "কোনও ভয় নেই। যা জিজ্ঞেস করব সঠিক উত্তর দেবে, তা হলেই আর কোনও ভয় নেই।"

"মিথ্যে কথা আমি বলি না, ফলে ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।" স্থির গলায় দৃঢ় উত্তর দিল তরুদি।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার ক্ষণকাল কালো, লম্বা, কঠিন চোখ-মুখের মেয়েটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "নাম কী তোমার?"

"তরু, তরুবালা সাঁতরা।"

"কত দিন হল এ বাড়িতে?"

"তা প্রায় বছর দশেক হবে।"

"এ বাড়িতে আসার আগে কোথায় ছিলে?"

"বর্ধমানে। ডাক্তার পুষ্পমালা মণ্ডলের কাছে। ছেলেবেলা থেকে উনিই আমায় মানুষ করেছেন। বিয়ে-থা দিয়েছেন।"

"স্বামী কোথায়?"

"নেই। বিয়ের পর বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই কলেরায় মারা যান।"

"ছেলেপুলে?"

"একটি ছেলে।"

"ডাক্তার পুষ্পমালা মণ্ডলের কাছে কী করতে?"

"ওই সংসার দেখাশোনা। তা ছাড়া গিন্নিমা আমায় ইঞ্জেকশন দেওয়া, প্রেশার মাপা এসবও শিখিয়েছিলেন। অনেক সময় মেয়ে রোগী বাড়িতে এলে এসব কাজও করতে হত আমায়।"

"গিন্নিমার ডাক্তারখানা থেকে এ বাড়িতে এলে কী করে?"

"এ বাড়ির কর্তাবাবু আর গিন্নিমার স্বামী ছিলেন বন্ধু। কর্তাবাবু নিজের দেখাশোনার জন্য লোকের খোঁজ করতে গিন্নিমা আমায় দেখিয়ে বললেন, 'নিজের হাতে তৈরি করেছি। কাজে লাগিয়ে দেখুন, ঠকবেন না।' "

"এ বাড়িতে কী কাজ করতে?"

"ওই তো, কর্তাবাবুর দেখাশোনা, ওষুধপত্তর দেওয়া, জামাটা-জুতোটা ঠিক করে রাখা, এই সব আর কী! তা ছাড়া দরকার পড়লে বাড়ির এটা-সেটা কাজ তো আছেই...।"

"বেশ, বেশ। তা এসব কিছুর জন্য মাইনেপত্তর কী পাও?"

"প্রথমে সাতশো পেতাম। পরে কর্তাবাবু বাড়িয়ে বারোশো করে দেন।"

"মাইনে ছাড়া আর কিছু পাও না?" চিকন গলায় প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন সমাদ্দারদারোগা।

"না, পাই না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল তরুদি।

"মিথ্যে কথা। খবরদার, পুলিশের কাছে মিথ্যে বললে ফল ভাল হবে না," সমাদ্দারদারোগার প্রচণ্ড হুঙ্কারে সারা ঘর যেন থরথর করে কাঁপতে থাকল। এমনকী পাখির মতো শক্ত মেয়েরও বুক কেঁপে উঠল।

কিন্তু তরুদির কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। পাথরের মতো শক্ত মুখে দৃঢ় গলায় একই কথা বলে চলল সে, "মাইনে ছাড়া আর কিছুই পাই না আমি, এ কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে।"

"আবার মিথ্যে কথা।" ফের গর্জন করে উঠলেন সমাদ্দারদারোগা, "প্রতি মাসে মাইনে ছাড়া আরও তিন হাজার

করে টাকা কর্তাবাবু তোমায় দিতেন। কর্তাবাবু সে কথা নিজে হাতে লিখে গিয়েছেন ডায়েরিতে। গেল মাসেও এই টাকা তিনি দিয়ে গিয়েছেন তোমায়, অস্বীকার করতে পারবে?"

তরুদি নির্বাক। জিনিয়া, পাখি স্তম্ভিত, হতবাক।

"না, চুপ করে থাকলে চলবে না। ইউ মাস্ট স্পিক আউট। বোবা সেজে পুলিশকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করলে তার ফল কী হবে তোমার বোধ হয় জানা নেই। দু' দিন জেলের ঘানি টানালে সব কথা আপনিই সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে।"

জ্বলন্ত দু' চোখ দারোগার মুখের উপর রেখে অকম্পিত গলায় তরুদি বলল, "পাঁচ বছর বয়স থেকে মা-বাপ হারিয়ে স্রেফ টিকে থাকতে গিয়ে এত লাথি-ঝাঁটা খেয়েছি যে, জেলের লাঠির ভয় তার কাছে নস্যি। টাকা আমি পেয়েছি কর্তাবাবুর কাছ থেকে সত্যি, কিন্তু কেন পেয়েছি সেকথা আমি বলব না। আমায় মেরে ফেললেও সেকথা আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না, এটা জেনে রাখুন," কথা শেষ করে হতবাক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার আর জিনিয়াদের চোখের সামনে দিয়েই গটগট করে ঘর ছেড়ে চলে গেল তরুদি।

॥ ১৬ ॥

কাজের বলতে প্রায় কিছুই নেই রংচটা, মরচে ধরা লোহার ট্রাঙ্কটায়। অতি ব্যবহারে জীর্ণ একজোড়া ধুতি-পাঞ্জাবি, একটা নতুন গামছা, শীতে পরার জন্য একটা মোটা ফুলহাতা সোয়েটার, একটা ভুসো কম্বল। এসবের নীচে হাত চালিয়ে সমাদ্দারদারোগা এক-এক করে বের করে আনলেন একটা পকেট-গীতা, পঁচাশি সালে দেখানো চোখের ডাক্তারের দু'টো প্রেসক্রিপশন, একটা ভাঙা চশমা।

হতাশ মুখে ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন সমাদ্দারদারোগা। তারপর ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বোলালেন। সেটারও অবস্থা তথৈবচ, একই রকম মলিন ও বিবর্ণ। জানলার কোল ঘেঁষে রাখা একটা চৌকি, পাশেই দেওয়ালে টাঙানো দড়িতে ঝুলছে একটা তেলচিটে পাজামা, গেঞ্জি আর গামছা। দেওয়ালে ঝোলানো কাঠের র‍্যাকে একটা হাত-আয়না, দাঁত ভাঙা চিরুনি। নস্যির খালি হয়ে যাওয়া দু'টো কৌটো আর-একটা ব্যবহার করা সাবান। হাত-আয়নাটা তুলতেই দেখা গেল একটা রংচটা ছোট পিচবোর্ডের খাপ আর কিছু দলাপাকানো রঙিন কাগজের টুকরো।

পিচবোর্ডের খাপটা খুলে দেখা গেল এলোমেলো মাথার চুল, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা একটি সাদামাঠা কিশোর মুখের সাদা-কালো ফোটো। ফোটোর নীচে খুদে-খুদে হরফে লেখা 'নিবারণ সমাদ্দার। বেঙ্গল রিডিং লাইব্রেরি, ১৩/বি মুচিপাড়া লেন।' ফোটোটা উলটেপালটে দেখে মন্তব্য করলেন সমাদ্দারদারোগা, "বোধ হয় কলেজে থাকার সময় তোলা। এ দিয়ে কি আর আজকের নিবারণ সমাদ্দারকে চেনা যাবে?"

পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে ফোটোটা দেখে মিহির দত্ত বললেন, "না, এ ফোটো কোনও কাজেই আসবে না। এখনকার নিবারণকাকা তো মোটাসোটা, চশমা পরা চকচকে টাকের এক মানুষ। এ ফোটো দেখে নিবারণকাকাকে খোঁজা মানে খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সমান।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার দলাপাকানো কাগজের টুকরোগুলো ভাল করে দেখতে-দেখতে মুচকি হেসে মিহির দত্ত আর রণবীর সান্যালের দিকে তাকিয়ে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "লটারির টিকিট? তার মানে ফোকটে বড়লোক হওয়ার একটা স্বপ্ন অনেক দিন ধরেই দেখতেন আপনাদের নিবারণবাবাজি। প্রায় লাখ টাকার চেকটা হাওয়া হয়ে যাওয়ার পিছনে এতক্ষণে যেন একটা মোটিভ দেখতে পাচ্ছি মশাই। হুঁ হুঁ, সেই যে কথায় বলে না, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে...।"

"কিন্তু আমার কেন জানি এখনও বিশ্বাস হয় না। নিবারণকাকার মতো সৎ, নিরীহ, ধর্মভীরু মানুষ," মাথা নেড়ে অবিশ্বাসী গলায় মিহির দত্ত বললেন, "যিনি মদনমোহনকে প্রণাম না করে দিন শুরু করতেন না, অর্ধেক সময় নিজের মাইনে তুলতেই ভুলে যেতেন, তিনি কিনা...!"

"রাখুন তো মশাই, কত ভোলাভালা মানুষ দেখলুম এই জীবনে। এদিকে গলায় কণ্ঠি, মুখে হরি-হরি, ওদিকে অনায়াসে দু'-চারটে গলা কেটে ফাঁক করছে, এরকম কত ধাপ্পাবাজ আলিপুর জেল আলো করে বসে আছে দেখুন না গিয়ে," তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন সমাদ্দারদারোগা।

"এটা কিন্তু দারোগাসাহেব নেহাত ভুল বলেননি মিহির," গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন রণবীর সান্যাল, "তোমার মতো আমারও নিবারণ সম্বন্ধে একই ধারণা ছিল। কিন্তু সেই ঘটনাটার পরে...।"

"কোন ঘটনা?" ভুরু তুলে জানতে চাইলেন সমাদ্দারদারোগা।

"সত্যি কথা বলতে কী, আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ। ব্রজেনের চেকটা খোয়া যাওয়ার ক' দিন পরের কথা। অফিসে বসে কয়েকটি জরুরি ফাইল পড়ছিল ব্রজেন। পোলট্রি ফার্মের কয়েকটি পেমেন্টের ব্যাপারে কথা বলতে আমিও ছিলাম ব্রজেনের ঘরে। অনেকক্ষণ ধরেই নিবারণকে একটা জরুরি ফাইল বের করে দিতে বলছিল ব্রজেন। ফাইল ক্যাবিনেট তোলপাড় করেও ফাইলটা পাচ্ছিল না নিবারণ। কাণ্ডকারখানা দেখে হঠাৎই বোমার মতো ফেটে পড়ল ব্রজেন। আমারই সামনে একেবারে যাচ্ছেতাই করে হেনস্থা করল নিবারণকে। একেবারে মুখের উপর বলে দিল ব্রজেন, 'বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবে না নিবারণ। এক-এক করে সব কিছু গায়েব করে আমার ব্যবসাটা লাটে তোলার মতলব, না? আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ! মনে রেখো, চেকটা না পেলে কম করে দশ বছর জেলের ভাত খাওয়াব তোমায়, তবে আমার নাম ব্রজেন দত্ত।' "

"তারপর, তারপর?" তাড়া লাগালেন সমাদ্দারদারোগা।

একটু দম নেওয়ার জন্য থেমেছিলেন রণবীর সান্যাল। দারোগাবাবুর তাড়ায় আবার শুরু করলেন, "ফাইলটা অবশ্য একটু পরেই পাওয়া গেল। ফাইল নিয়ে ব্রজেন মগ্ন হয়ে যেতে আমিও কাগজটা টেনে নিলাম। খবরের কাগজ ওলটাতে-ওলটাতে হঠাৎই নিবারণের চোখে চোখ পড়ে গেল আমার। উফ! কী ভয়ংকর জ্বলন্ত সেই দৃষ্টি! গুলি খাওয়া আহত বাঘ যেমন নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায় সব কিছু, তেমনই ব্রজেনকেও যেন ফালাফালা করে দিতে চাইছিল সেই জ্বলন্ত দু'টো চোখ। আজ মনে হয়, কাজটা সেদিন মোটেও ভাল করেনি ব্রজেন। ওই এক অপমানের চাবুক পিঠে পড়ায় নিবারণের মতো শান্ত, নিরীহ মানুষটা যেন পাগলা কুকুরের মতো খেপে

গিয়েছিল। আর সেই অপমানের বদলা নেওয়ার জন্যই হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্রজেনকে খুন করে..." বলতে-বলতে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেলেন রণবীর সান্যাল।

"কথাগুলো বলে আপনি ভালই করলেন মিঃ সান্যাল। নিবারণবাবুর সম্বন্ধে এবার একটু সিরিয়াসলি ভাবনাচিন্তা করতে হবে। মানুষটিকে যত সহজ, সরল ভাবতেন আপনারা, আসলে হয়তো তা ছিলেন না," চিন্তিত মুখে বললেন সমাদ্দারদারোগা, "বাই দ্য ওয়ে, নিবারণবাবুর ঘরদোর, আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে কিছু জানা আছে মিহিরবাবু?"

"না, ওসব তো আমি ঠিক...। আসলে নিবারণকাকাকে নিয়োগ তো বাবাই করেছিলেন, জানলে একমাত্র বাবাই জানতেন হয়তো," হাত উলটে অসহায় মুখ করে বললেন মিহির দত্ত। "তবে নিবারণকাকাকে কোনও দিন নিজের দেশের বাড়ির, আত্মীয়স্বজনের কথা বলতে শুনিনি। তাঁর কাছে বিশেষ কেউ আসতও না বড় একটা। আমাদের বাড়ি, ঘরদোর, আমরাই ছিলাম তাঁর সব। তাই তাঁর মতো মানুষের পক্ষে বাবাকে..." ঘনঘন মাথা নাড়লেন মিহির দত্ত।

"মানুষের মন বড় বিচিত্র দত্তসাহেব, এমনকী নিবারণবাবুরও..." মুচকি হেসে বললেন সমাদ্দারদারোগা।

"হঠাৎ একথা বলছেন কেন?"

"কেন আবার? দেখুন না চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে। লোকটির নিজের বলতে যা কিছু সবই তো প্রায় পড়ে আছে, তাই না? অথচ নেই শুধু একটা তুচ্ছ জিনিস, একগোছা নিমের দাঁতন। ব্রজেনবাবু খুন হওয়ার দিন সকালে বাগানের মালিকে দিয়ে ওই দাঁতনের গোছাটা জোগাড় করেছিলেন নিবারণবাবু, সে খবর আমার কাছে আছে। অথচ দেখুন, কোথাও সেই দাঁতনগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ বেশ কিছুদিন কোথাও গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য বোধ হয় চুপিচুপি তৈরি হচ্ছিলেন নিবারণবাবাজি। হয়তো এমন কোনও জায়গা, যেখানে চট করে আর যা-ই পাওয়া যাক, দাঁতন পাওয়া যাবে না। তাই একমাত্র সেগুলোই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন আপনাদের ধর্মাত্মা। না, শেষ পর্যন্ত সেই খড়ের গাদায় সুচ খোঁজাই আছে কপালে," বলতে-বলতে পিচবোর্ডের খাপে সাঁটা নিবারণ সমাদ্দারের তরুণ বয়সের ফোটোটা পকেটে রাখলেন দারোগাবাবু।

"ওই ছবিটা কি সত্যিই কোনও কাজে আসবে?" অনিশ্চিত গলায় প্রশ্ন করলেন মিহির দত্ত।

"নিবারণবাবুর কোনও রিসেন্ট ফোটো আছে নাকি আপনার স্টকে? তা হলে তো কাজ অনেকটা এগিয়ে যায় মশাই," পালটা প্রশ্ন করলেন সমাদ্দারদারোগা।

"ফোটো, নিবারণকাকার? কই, না, মনে পড়ছে না তো। আফটার অল বাড়ির কর্মচারীর ফোটো কে আর আলাদা করে তুলে রাখে বলুন?"

"এইটাই তো ভুল আপনাদের। আরে মশাই, বাড়ির কর্তাবাবু থেকে শুরু করে ম্যানেজার, জমাদার, মায় পোষা মেনি বিড়ালেরও একটা করে ফোটো তুলিয়ে রাখতে হয়। বলা তো যায় না, কখন কোন কাজে লেগে যায়! এখন দেখি, যদি পুলিশের আর্টিস্ট নিবারণবাবাজির পুরনো ফোটোটার ভিত্তিতে সাম্প্রতিক চেহারার একটা মোটামুটি আন্দাজ দিতে পারে। কেসটা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে এই ধর্মাত্মাকে খোঁজার জন্য কাগজে ফোটো সহ একটা বিজ্ঞাপন দিতেই হবে। তারপর একবার যদি ব্যাটাচ্ছেলেকে ধরতে পারি, তা হলে আমার প্রেসিডেন্ট মেডেলটা আটকায় কে?" বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সমাদ্দারদারোগা।

॥ ১৭ ॥

"কাইন্ডলি একটু বসুন অফিসার। হাতের পেশেন্টটিকে ছেড়ে দিয়েই আমি ডেকে নিচ্ছি আপনাকে।"

"অকারণে ব্যস্ত হবেন না ডক্টর সামন্ত। ইউ টেক ইয়োর টাইম," বলতে-বলতে একটা পুরনো ম্যাগাজিন টেনে নিলেন সমাদ্দারদারোগা। পকেট থেকে যথারীতি নস্যির ডিবেও বেরিয়ে পড়ল। রিডিং গ্লাস নাকে সেঁটে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে থাকলেন সমাদ্দারদারোগা।

আধঘণ্টা পর ডাক্তার সামন্ত ডেকে নিলেন সমাদ্দারদারোগাকে নিজের চেম্বারে, "আই অ্যাম সরি অফিসার, ফর দ্য ডিলে। যাক আপাতত কোনও পেশেন্ট নেই। আরাম করে বসুন অফিসার। একটু কফি আনাই। কফি খেতে-খেতে না হয় কথাবার্তা বলা যাবে।"

কফির সঙ্গে ডালমুটও এল। ডালমুট চিবোতে-চিবোতে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "আপনার পেশেন্ট ব্রজেন দত্তর ব্যাপারে দু'-একটা কথা জানতেই আসা।"

"কোন ব্রজেন দত্ত?" খানিকটা চিন্তা করলেন ডাক্তার সামন্ত। তার পরেই, "ও বুঝেছি-বুঝেছি, দত্ত ভিলা, সানফ্লাওয়ারের মালিক। ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড," সখেদে মাথা নাড়লেন ডক্টর সামন্ত, "খবরটা পেয়ে আমি তো রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম মশাই। ওই বৃদ্ধ মানুষটিকে কে মার্ডার করল আর কেনই বা করল?"

"সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন," গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন সমাদ্দারদারোগা।

"যাই হোক, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি অফিসার?" কৌতূহলী চোখে সমাদ্দারদারোগার দিকে তাকালেন ডক্টর সামন্ত।

"বলছি। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ব্রজেন দত্ত কত দিন ধরে আপনার পেশেন্ট ছিলেন?"

"তা প্রায় বারো বছর তো বটেই। শুধু উনি কেন, ওঁর বাড়ির সকলকে তো আমিই দেখাশোনা করি।"

"বেশ, বেশ। তা দত্তবাবুর ক্রনিক অসুখবিসুখ কী ছিল?"

"দত্তবাবুর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল। তার উপরে লাস্ট ডিসেম্বরে একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে শরীরটা বেশ ধাক্কা খায়। তা ছাড়া প্রেশারটা তো বরাবরই চড়া ছিল। ইদানীং নানা অশান্তিতে সেটা খুবই ওঠানামা করছিল। সেটাও বেশ চিন্তার কারণ ছিল।"

"ব্রজেন দত্তর পারিবারিক অশান্তির কথা উনি কি কখনও আপনাকে বলেছিলেন?"

"সেভাবে খোলাখুলি কখনও বলেননি। তবে ছোট ছেলে এবং নাতিকে নিয়ে প্রবলেমের কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছিলেন। তা

ছাড়া নাতি মানে সুকল্যাণের চিকিৎসাও তো আমিই...।"

"আচ্ছা, ব্রজেনবাবু ওষুধপত্র কী খেতেন?" নোটবইয়ে কলম চালাতে-চালাতে সমাদ্দারদারোগা জিজ্ঞেস করলেন।

"ওষুধ বলতে হার্টের আর প্রেশারের ওষুধ তো ছিলই। তা ছাড়া ওঁর টেনশন কমিয়ে প্রেশারটাকে স্টেডি করতেও ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলাম। তিন-চার মাস ধরে খেয়ে যথেষ্ট উপকারও যে পেয়েছিলেন সেটা উনি নিজেই বলেছিলেন।"

"আচ্ছা, 'দত্ত ভিলা'র অন্য কোনও সদস্যকে কি আপনি কখনও ঘুমের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলেন?"

সামান্য চিন্তা করে ডক্টর সামন্ত বললেন, "কিছুদিন আগে গলস্টোনের প্রবলেমে আশাদেবী খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলাম। তা ছাড়া সুকল্যাণকেও দিতে হয়েছে। পুওর চ্যাপ, ওর কেসটা তো জানেনেই আপনি। কিন্তু হঠাৎ করে কেবল ঘুমের ওষুধের কথাই জিজ্ঞেস করছেন কেন মিঃ সমাদ্দার?"

"কারণ আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি ডক্টর সামন্ত," আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে মুখে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "ব্রজেন দত্তর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করার পর যে রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে, তাতে বলা হয়েছে, মৃতের পাকস্থলীতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমের ওষুধ পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ আগে যে কফি ব্রজেন দত্ত পান করেছিলেন, সেই কফির সঙ্গেই এই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ওষুধের প্রভাবে ভিক্‌টিম আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তারপর তাঁকে খুন করা হয়। মাথা আর ঘাড়ের মাঝখানে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়ায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ভিক্‌টিমের।"

"মাই গড! এ তো প্রফেশনাল হাতের কাজ!"

"এখন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ডক্টর সামন্ত," গম্ভীর মুখে বললেন সমাদ্দারদারোগা, "আশা করি উত্তর দিতে অসুবিধে হবে না।"

"উত্তরটা জানা থাকলে অসুবিধে হবে কেন মশাই?" হাসতে-হাসতে বললেন ডক্টর সামন্ত।

"প্রশ্নটা হল, যে পদ্ধতিতে ব্রজেন দত্তকে খুন করা হয়েছে, তা কি একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব? অর্থাৎ যে কেউ কি এভাবে খুন করতে পারে?"

"ইট্‌স এ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন। সত্যি কথা বলতে কী, মানবশরীর সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ কাজ একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়, এটুকু আপনাকে বলতে পারি অফিসার।"

"থ্যাঙ্ক্‌স। মেনি মেনি থ্যাঙ্ক্‌স। আপনি যে আমার কী উপকার করলেন জানেন না," চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন সমাদ্দারদারোগা

"এ কথা বলবেন না অফিসার। আপনাকে সাহায্য করাটা তো আমার ডিউটি। তবে কেসটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল যদি একটু জানান তবে সত্যিই খুশি হব। আফটার অল ব্রজেন দত্ত আমার পেশেন্ট ছিলেন।"

"ও শিওর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যথাসময়ে সব জানতে পারবেন," বলতে-বলতে ডক্টর সামন্তের চেম্বার থেকে পা বাড়ালেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শরীরশিক্ষা পরিচয়

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

PRASA-02

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্ত্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন: ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স: ২৩৫০-৯৩৫১

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

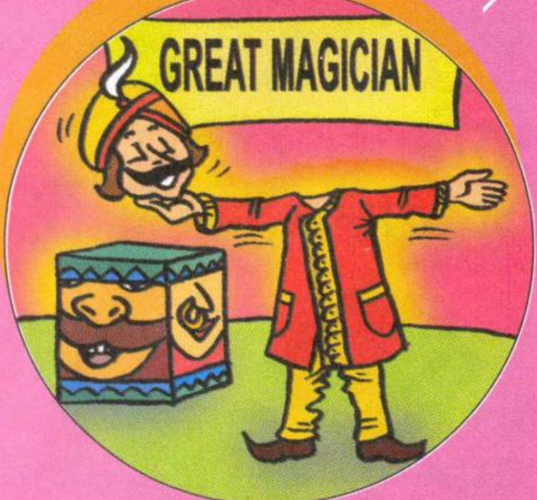

উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

দশ বছরের টুকুনকে ইংরেজি পড়াচ্ছিলেন তার বাবা। হঠাৎই টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "ধরো, ইংরেজি অক্ষর 'টি' তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে টি-পার্টি করছে। সকলেই 'টি'-এর বাড়িতে চলে এসেছে, চা খাচ্ছে, শুধু ছ' জন তখনও আসেনি। কারা আসেনি বলো তো?"
প্রশ্ন শুনে ধন্দে পড়ে গেলেন টুকুনের বাবা। অনেক ভেবেচিন্তেও উত্তর খুঁজে পেলেন না তিনি। সেটা জানাতে ছেলে বলে উঠল, "এটা পারলে না! সেই চা-পার্টিতে আসেনি 'ইউ', 'ভি', 'ডব্লু', 'এক্স', 'ওয়াই' এবং 'জ়েড'! কারণ এরা সকলেই 'টি' (Tea)-এর পরেই আসে।

স্কুলে বিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক। পড়াতে-পড়াতে বললেন, "বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজ়াক নিউটন একবার একটি আপেল গাছের নীচে বসে ছিলেন। হঠাৎই তাঁর মাথায় একটি আপেল এসে পড়ে, আর তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রধান সূত্রটা পেয়ে যান এই ঘটনা থেকেই। এ-সম্বন্ধে তোমাদের কী মনে হয়?... হ্যাঁ, তুমি বলো সুপ্রিয়।"
সুপ্রিয় উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, "এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, আইজ়াক নিউটন যদি আমাদের মতো শুধু ক্লাসে বসে বই পড়তেন, তা হলে কোনও দিনও কিছু আবিষ্কার করতে পারতেন না!"

শিক্ষক-ছাত্রীর কথোপকথন। শিক্ষক: টুপুর, তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে পৃথিবী গোলাকার?
টুপুর: আমি প্রমাণ করতে পারব না, স্যার। তা ছাড়া, আমি নিজে তো একবারও বলিনি যে, পৃথিবী গোল!

পাড়ায় অমিত নতুন ফুটবল কিনেছে, এই নিয়ে 'সবুজ সংঘ' ক্লাবের ছেলেরা দারুণ উৎসাহিত! কিন্তু আজ বিকেলে অমিত নিজে মাঠে আসেনি! কচি খেলুড়েদের মাথায় হাত, এমন তো কোনও দিন হয়নি! ফুটবল ছাড়া যে বিকেলটাই মাটি! তাই বাধ্য হয়ে গুটিগুটি পায়ে ছেলেরা অমিতের বাড়ির সামনে গিয়ে ডাক দিল। বেরিয়ে এলেন তার মা। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"
"অমিত আজ খেলতে আসবে না?"
"না, ওর শরীর খারাপ।"
শুনে করুণ মুখে প্রশ্ন করল ছেলের দল, "কাকিমা, অমির ফুটবলেরও কি শরীর খারাপ? সেটাও কি খেলতে আসতে পারবে না?"

রবিবারের সকালে মায়ের রান্না করা মন দিয়ে দেখছিল ছোট্ট তোয়াই। হঠাৎই তার চোখ গেল মায়ের কয়েক গোছা পাকা চুলের দিকে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে তোয়াই জিজ্ঞেস করল, "এ কী মা, তোমার মাথায় পাকা চুল কেন?"
মা বললেন, "তুমি যখনই দুষ্টুমি করো বা আমার কথা শোনো না, তখনই একটি করে চুল পেকে যায়, বুঝেছ?" উত্তর শুনে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবল তোয়াই। তারপর খুব খুশি হয়ে বলে উঠল, "এত দিনে বুঝলাম কেন দিদার মাথার সব চুল সাদা!"

অর্থ শেখো

নীচের শব্দগুলো আকারে খুবই ছোট, কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তিধর। এরা না থাকলে ভাষার জোর বাড়ত না। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই ধরনের ছোটখাটো শব্দের যথেষ্ট কদর আছে। কারণ, বিশেষ ক্ষেত্রে এরা দারুণ কাজে লাগে। নীচের শব্দগুলো এই ধরনের। প্রত্যেকটি শব্দের পাশে আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে কয়েকটি। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে।

চীর: (১) বসন, (২) কাগজের টুকরো, (৩) ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, (৪) ভগ্নাবশেষ ।

বান্দা: (১) অপরাধ হেতু বন্দি, (২) ভৃত্য, (৩) বন্ধক, (৪) দাসীপুত্র ।

ধান্দা: (১) কাজ, (২) ব্যবসায় বৃত্তি, (৩) মুশকিল, (৪) নিজের সুবিধের জন্য কাউকে ফ্যাসাদে ফেলার চেষ্টা ।

ধ্রুব: (১) আকাশের দক্ষিণ দিকে উদিত তারা, (২) অস্থির, (৩) নিশ্চিত, (৪)চিরন্তন ।

আস্য: (১) তীক্ষ্ণ দন্ত, (২) রক্তচক্ষু, (৩) মুখ, (৪) হস্ত ।

গত সংখ্যার উত্তর

ঋজুস্বভাব: (৩) সরল স্বভাব। যেমন, 'তুমি নিতান্তই ঋজুস্বভাব, কাহার কী ভাব কিছুতেই বুঝিতে চেষ্টা কর না।' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

পতিতপাবন: (৪) পাপীদের উদ্ধারকর্তা। যেমন, 'অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।' (কৃত্তিবাস ওঝা)

মুষ্টিযোগ: (৩) টোটকা ওষুধ। যেমন, 'সত্যর কয়েকটি মুষ্টিযোগ জানা ছিল।' (পরশুরাম)

হেঁজিপেঁজি: (৪) আজেবাজে। যেমন, 'দামুকাকাও নেহাত হেঁজিপেঁজি নন।' (লীলা মজুমদার)

পর্জন্যদেব:(৩) ইন্দ্রদেব। যেমন, হে পর্জন্যদেব জল দাও, জল ঢালো।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) জাদুকরের চুলের রং পালটে গিয়েছে। (২) জাদুকরের পাগড়ির উপরের পালকটা ছোট। (৩) পাগড়ির রং পালটে গিয়েছে। (৪) বাঁ হাতের জামার হাতাটা ছোট। (৫) জাদুবাক্সের উপরে আঁকা মেয়েটির নাকে নাকছাবি নেই। (৬) জাদুকরের বাঁ দিকের জামার পকেটটা ছোট। (৭) পাজামার রং পালটে গিয়েছে। (৮) জাদুবাক্সের উপরে আঁকা লোকটির চোখের অংশ দেখা যাচ্ছে না।

শব্দসন্ধান

সংকেত: পাশাপাশি

(১) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, ফন্দি। (৩) যা সত্য নয়, মিথ্যা, অসম্ভব। (৫) কোনও জিনিসের গুণ বিচার, যাচাই। (৬) ব্যাঙ। (৭) হাতের কড়ে আঙুলের পাশের আঙুল। (৮) অনুকরণ, প্রতিলিপি, ঝুটো, জাল। (১০) জিভ। (১১) বিচারপতি, ইউনানি চিকিৎসক। (১৪) শেষ হয়েছে এমন। (১৫) বকুনি, তিরস্কার। (১৭) ব্যথা, বেদনা, মমতা। (১৯) সতেজ বা সজীব ভাব। (২১) ভেবেচিন্তে দেখা, বিবেচনা। (২২) দুর্বল, নিস্তেজ। (২৩) যে মিষ্টান্ন তৈরি ও বিক্রি করে। (২৪) আয়, উপার্জন।

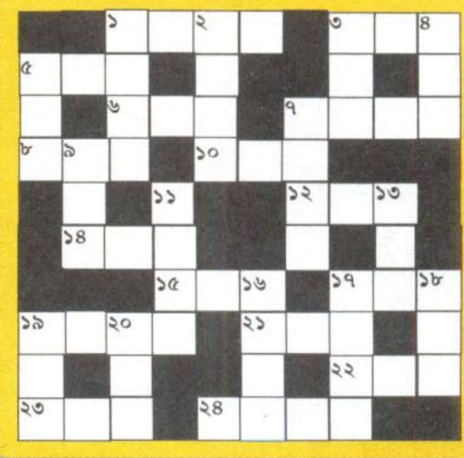

সংকেত: উপর-নীচ

(১) কোমল ও মিহি কাপড়। (২) যাতে লজ্জিত হতে হয় এমন। (৩) অচেনা, অপরিচিত। (৪) শিলা, বৃষ্টির সঙ্গে যে ছোট বরফের টুকরো পড়ে। (৫) বাতাস, বায়ু। (৭) না খেয়ে থাকা। (৯) মাটির বা ধাতুর তৈরি জলপাত্র, ঘড়া। (১১) সকলের অজ্ঞাত ও অগোচরে লুকনো ধনসম্পদ। (১৩) পায়ের নূপুর। (১৬) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য। (১৭) প্রয়োজন, ঠেকা। (১৮) অধিকার, কর্তৃত্ব, পটুতা। (১৯) খুব বেশি, চূড়ান্ত, শেষ। (২০) অশ্বশালা, আস্তাবল।

দেবসেনাপতি

দে	ব	রা	জ		তা	ল	বে	তা	ল
শ		খা					দ		জ্ঞি
বি	শা	ল		ম		অ	না	হূ	ত
দে				হা			দা		
শ	শ	ক		দে	বা	ল	য়		
		ম	নো	ব	ল		ক	ল	হ
		ল			খি				ঠ
অ	তি	লো	ভ		ল্য		শি	বি	কা
মৃ		চ					শি		রি
ত	প	ন	তা	প		নী	র	ব	তা

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০০৭

১৬টি বিশ্বকাপ বাহিনীর বাছাই যোদ্ধারা

আর কয়েক দিন পরেই শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধ। সেরার মুকুট ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ১৫ জন বাছাই যোদ্ধা নিয়ে তৈরি ১৬টি বাহিনীও। ওয়েস্ট ইন্ডিজে এই জয়পরাজয়ের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকব আমরাও।

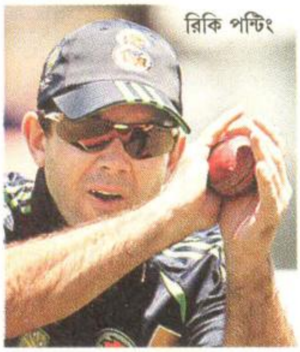
রিকি পন্টিং

অস্ট্রেলিয়া

১। রিকি পন্টিং (অধিনায়ক), ২। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (উইকেটরক্ষক), ৩। ব্র্যাকেন, ৪। মাইকেল ক্লার্ক, ৫। ব্র্যাড হ্যাডিন (উইকেটরক্ষক), ৬। ম্যাথু হেডেন, ৭। ব্র্যাড হজ, ৮। ব্র্যাড হগ, ৯। মাইক হাসি, ১০। জনসন, ১১। ব্রেট লি, ১২। গ্লেন ম্যাকগ্রা, ১৩। অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস, ১৪। শন টেট, ১৫। শন ওয়াটসন।

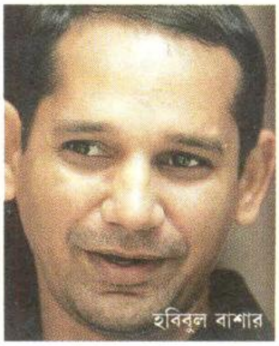
হবিবুল বাশার

বাংলাদেশ

১। হবিবুল বাশার (অধিনায়ক), ২।শাহরিয়ার নাফিস (সহঅধিনায়ক), ৩। আব্দুর রজ্জাক, ৪। আফতাব আহমেদ, ৫। জাভেদ ওমর, ৬। মশারফ মোরতাজা, ৭। মহম্মদ আশরাফুল, ৮। মহম্মদ রফিক, ৯। মুশফিকর রহিম, ১০। রজিন সালেহ, ১১। সকিবুল হাসান, ১২। শাহাদাত হোসেন, ১৩। সইদ রাসেল, ১৪। তামিম ইকবাল, ১৫। তাপস বৈশ্য।

নিউজিল্যান্ড

১। স্টিফেন ফ্লেমিং (অধিনায়ক), ২। লুই ভিনসেন্ট, ৩। পিটার ফুলটন, ৪। রস টেলর, ৫। স্কট স্টাইরিস, ৬। জেকব ওরাম, ৭। ক্রেগ ম্যাকমিলান, ৮। ব্রেনডন ম্যাককুলাম, ৯। ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, ১০। জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন, ১১। জিতেন পটেল, ১২। শেন বন্ড, ১৩। গিলেস্পি, ১৪। মিশেল ম্যাসন, ১৫। ডারেল টাফি।

স্টিফেন ফ্লেমিং

পাকিস্তান

১। ইনজামাম-উল-হক (অধিনায়ক), ২। ইউনিস খান (সহঅধিনায়ক), ৩। আব্দুল রজ্জাক, ৪। দানিশ কানেরিয়া, ৫। ইফতিখার অঞ্জুম, ৬। ইমরান নজির, ৭। কামরান আকমল (উইকেটরক্ষক), ৮। মহম্মদ আসিফ, ৯। মহম্মদ হাফিজ, ১০। মহম্মদ ইউসুফ, ১১। নাভেদ-উল-হাসান, ১২। শাহিদ আফ্রিদি, ১৩। শোয়েব আখতার, ১৪। শোয়েব মালিক, ১৫। উমর গুল।

ইনজামাম-উল-হক

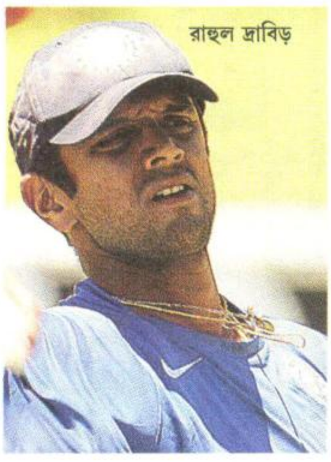
রাহুল দ্রাবিড়

ভারত

১। রাহুল দ্রাবিড় (অধিনায়ক), ২।সচিন তেন্ডুলকর (সহঅধিনায়ক), ৩। অজিত আগরকর, ৪। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি (উইকেটরক্ষক), ৫। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। হরভজন সিংহ, ৭। দীনেশ কার্তিক (উইকেটরক্ষক), ৮। জাহির খান, ৯। অনিল কুম্বলে, ১০। মুনাফ পটেল, ১১। ইরফান পাঠান, ১২। বীরেন্দ্র সহবাগ, ১৩। শ্রীশান্ত, ১৪। উথাপ্পা, ১৫। যুবরাজ সিংহ।

ম্যাথু ভন

ইংল্যান্ড

১। ম্যাথু ভন (অধিনায়ক), ২। জে এম অ্যান্ডারসন, ৩। আই আর বেল, ৪। আর এস বোপারা, ৫। পি ডি কলিংউড, ৬। অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, ৭। জে ডব্লিউ এম ড্যালরিম্পেল, ৮। ই সি জয়েস, ৯। জে লুইস, ১০। এস এল মেহমুদ, ১১। পি এ নিক্সন (উইকেটরক্ষক), ১২। মন্টি পানেসর, ১৩। কেভিন পিটারসেন, ১৪। এল ই প্লাঙ্কেট, ১৫। এ জে স্ট্রস।

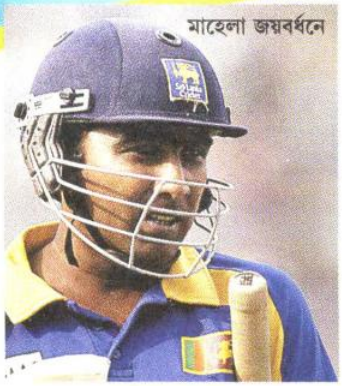

মাহেলা জয়বর্ধনে

শ্রীলঙ্কা

১। মাহেলা জয়বর্ধনে (অধিনায়ক), ২। রাসেল আর্নল্ড, ৩। এম এস আতাপাত্তু, ৪। সি এম বান্দারা, ৫। টি এম দিলশন, ৬। সি আর ডি ফার্নান্ডো, ৭।সনৎ জয়সূর্য, ৮। কে এম ডি এন কুলাসেখরা, ৯। এম এফ মহরুফ, ১০। এস এল মালিঙ্গা, ১১। মুথাইয়া মুরলিধরন, ১২। কে সি সাঙ্গাকারা (উইকেটরক্ষক), ১৩। এল পি সি সিলভা, ১৪। ডব্লিউ ইউ থরঙ্গা, ১৫। চামিণ্ডা ভাস।

জেরেমি ব্রে

আয়ারল্যান্ড

১। ডি টি জনস্টন (অধিনায়ক), ২। ডব্লিউ কে ম্যাককালান (সহঅধিনায়ক), ৩। এ সি বোথা, ৪। জেরেমি ব্রে, ৫। কে ই ডি ক্যারল, ৬। পি জি গিলেস্‌পি, ৭। ডি ল্যাঙ্গফোর্ড স্মিথ, ৮। জে এফ মুনি, ৯। পি জে কে মুনি, ১০। ই জে জি মরগ্যান, ১১। কে জে ও'ব্রায়েন, ১২। এন জে ও'ব্রায়েন (উইকেটরক্ষক), ১৩। ডব্লিউ টি এস পোর্টারফিল্ড, ১৪। ডব্লিউ বি র‍্যাঙ্কিন, ১৫। এ আর হোয়াইট।

জিম্বাবোয়ে

১। পি উৎসেয়া (অধিনায়ক), ২। জি বি ব্রেন্ট, ৩। সি জে চিভাভা, ৪। ই চিগুম্বুরা, ৫। কে এম ডাবেঙ্গা, ৬। টি ডাফিন, ৭। এ জে আয়ারল্যান্ড, ৮। এফ কাস্তেনি, ৯। এস মাতসিকেনয়েরি, ১০। সি বি পোফু, ১১। টি মুপারিওয়া, ১২। ই সি রেনসপোর্ড, ১৩। ভি সিবান্দা, ১৪। বি আর এম টেলর (উইকেটরক্ষক), ১৫। এস সি উইলিয়ামস।

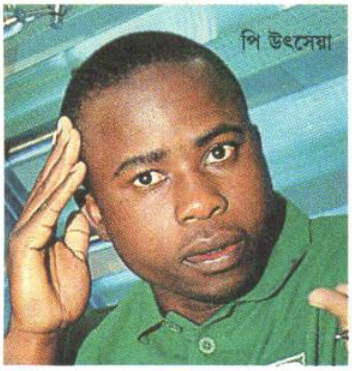

পি উৎসেয়া

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

১। ব্রায়ান লারা (অধিনায়ক), ২। আই ডি আর ব্র্যাডশো, ৩। ডি জে ব্র্যাভো, ৪। শিউনারায়ন চন্দ্রপল, ৫। সি ডি কলিমোর, ৬। ক্রিস গেইল, ৭। কে এ পোলার্ড, ৮। ডি বি পাওয়েল, ৯। ডি বি রামডিন (উইকেটরক্ষক), ১০। এম এন স্যামুয়েলস, ১১। রামনরেশ সারওয়ান, ১২। এল এম পি সাইমন্‌স, ১৩। ডি আর স্মিথ, ১৪। ডি এস স্মিথ, ১৫। জে ই টেলর।

ব্রায়ান লারা

আউট হয়েছেন রোমেন

বারমুডা

১। আই এইচ রোমেন (অধিনায়ক), ২। ডি এ মাইনরস (সহঅধিনায়ক), ৩। ডি সি বোর্ডেন, ৪। এল ও ক্যান, ৫। ডি এল হেম্প, ৬। কে হার্ডেল, ৭। এম জোন্‌স, ৮। এস কেলি, ৯। ডি এম লেভেরক, ১০। এস মুকুন্দেম, ১১। এস ডি আউটারব্রিজ, ১২। ও এল পিচার, ১৩। সি জে স্মিথ, ১৪। জে জে টাকার, ১৫। কোয়ামে টাকার (উইকেরক্ষক)।

গ্রেম স্মিথ

দক্ষিণ আফ্রিকা

১। গ্রেম স্মিথ (অধিনায়ক), ২। জে এইচ কালিস (সহঅধিনায়ক), ৩। এল এল বসম্যান, ৪। এম ভি বাউচার (উইকেটরক্ষক), ৫। এ বি ডেভিলিয়ার্স, ৬। এইচ এইচ গিব্‌স, ৭। এ জে হল, ৮। জে এম কেম্প, ৯। সি কে ল্যাঙ্গেভেল্ড, ১০। এ নেল, ১১। এম এনতিনি, ১২। আর জে পিটারসন, ১৩। এস এম পোলক, ১৪। এ জি প্রিন্স, ১৫। আর তেলেম্যাক্‌কাস।

কানাডা

১। জে এম ডাভিসন (অধিনায়ক), ২। কে টি সান্ধের, ৩। ডি আর চৌমনে, ৪। এ বাগাই (উইকেটরক্ষক ও সহঅধিনায়ক), ৫। জি ই এফ বারনেট, ৬। ইউ ভাট্টি, ৭। আই এস বিলক্লিফ, ৮। এ কডরিঙ্কটন, ৯। জি আর কডরিঙ্কটন, ১০। এ সি কামিন্স, ১১। এস ধানিরাম, ১২। এ এ মুল্লা (উইকেটরক্ষক), ১৩। এইচ ওসিন্ডে, ১৪। কোয়াইসার আলি, ১৫। এ এম সমদ।

জে এম ডাভিসন

কিনিয়া

১। স্টিভ টিকোলো (অধিনায়ক), ২। টি এম ওডোয়ো (সহঅধিনায়ক), ৩। আর ভুদিয়া, ৪। জে কে কামান্ডে, ৫। টি মিশ্র, ৬। সি ও ওবুয়া, ৭। ডি ও ওবুয়া, ৮। ওধিয়াম্বো, ৯। পি জে অনগন্ডো, ১০। এল এন অনইয়াঙ্গো, ১১। এম এ আওমা (উইকেটরক্ষক), ১২। এম এল পটেল, ১৩। আর ডি শাহ, ১৪। এ ও সুজি, ১৫। এইচ এ ভেরাইয়া।

স্টিভ টিকোলো

স্কটল্যান্ড

১। সি এম রাইট (অধিনায়ক), ২। জে এ আর ব্লেইন, ৩। ডি আর ব্রাউন, ৪। জি এম হ্যামিল্টন, ৫। আর এম হক, ৬। পি জে সি হফম্যান, ৭। আর ও হুসেন, ৮। ডি আর লোখার্ট, ৯। আর টি লিয়নস, ১০। এন এফ আই ম্যাককুলাম, ১১। জে ডে নেল, ১২। এন এস পুনিয়া, ১৩। সি জে ও স্মিথ (উইকেটরক্ষক), ১৪। আর আর ওয়াটসন, ১৫। ডি এফ ওয়াটস।

নেদারল্যান্ডস

১। এল পি ভ্যান ট্রুস্ট (অধিনায়ক), ২। বি জুইডেরেন্ট, ৩। আদিল রাজা, ৪। পি ডব্লিউ বরেন, ৫। টি বি এম দে লিডি, ৬। এম বি এস জঙ্কম্যান, ৭। এ এন কারভিজি, ৮। মহম্মদ কাশিফ, ৯। ডি জে রিকার্স, ১০। ই শিফারলি, ১১। জে স্মিথস (উইকেটরক্ষক), ১২। ডব্লিউ এফ স্টেলিন, ১৩। ই এস জুয়ারজিস্কি, ১৪। আর এন টেন ডোশেট, ১৫। ডি এল এস ভ্যানবাঞ্জ।

ভারতে ক্রিকেটম্যাচ দেখার সময়

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রতিটি ম্যাচ শুরু হবে গ্রিনিচ মিন টাইম অনুসারে বেলা দেড়টা থেকে অর্থাৎ ভারতীয় সময় সন্ধে সাতটা থেকে।

বাংলার মনোজ ভারতের আশা

"নির্বাচকরা আগে থেকেই বিশ্বকাপের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। আমার মতো নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে কম্বিনেশন ভাঙতে চাননি হয়তো!" অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়কে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন মনোজ তিওয়ারি

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

ছেলেবেলায় সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম, আর খাওয়ার সময় ঠিক বাড়ি চলে আসতাম। হাওড়ার সেন্ট টমাস চার্চ স্কুলের দিনগুলো আজও মনে পড়ে।

আপনি কি ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন?

ক্রিকেট ছেলেবেলা থেকেই ভাল খেলতাম, তবে বাংলার হয়ে খেলব কখনও ভাবতে পারিনি। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই সুযোগ পেয়ে গেলাম অনূর্ধ্ব ১৬ বাংলা দলে। তখন থেকেই একটু-একটু করে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকি।

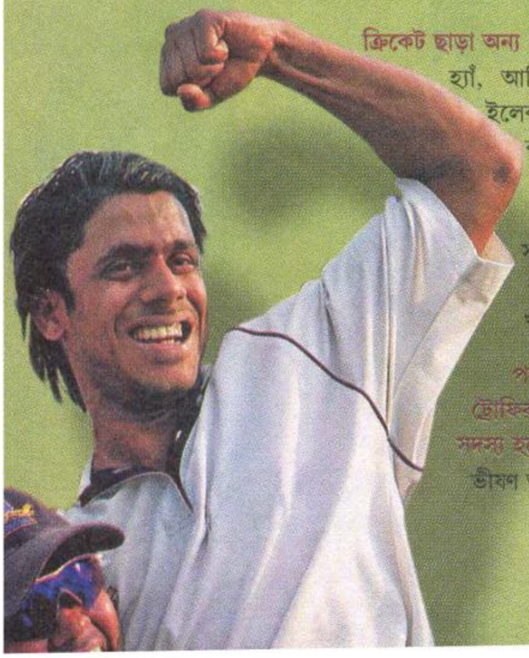

ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোনও পেশা আছে?

হ্যাঁ, আমি এখন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে সিনিয়র স্পোর্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করি। সহকর্মীরা খেলার ব্যাপারে আমাকে খুবই সাহায্য করেন।

পর-পর দু'বার রণজি ট্রফির ফাইনালিস্ট দলের সদস্য হয়ে কীরকম লাগছে?

ভীষণ ভাল লাগছে। জিতলে আরও ভাল লাগত। তা ছাড়া ভাল খেলেও হেরে গেলে খুবই খারাপ লাগে। ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরে গিয়ে খুবই ভেঙে পড়েছিলাম।

পরের মরশুমে কি রণজি ট্রোফি বাংলায় আসছে?

আমরা এখন যে-রকম ফর্মে আছি তাতে সেটা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মাঠে আমরা সকলেই নিজেদের সেরাটুকু দেওয়ার চেষ্টা করি। আর তা ছাড়া কোচ পরেশ মামরে আমাদের মধ্যে একটা আলাদা জোশ এনে দিয়েছেন। প্রচুর নতুন টেকনিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ভিডিও ক্লিপিংস দেখিয়ে নিজেদের ত্রুটিও দেখানো হচ্ছে। এমনকী খেলার আগে ব্যাটস্ম্যান ও বোলারদের নিয়ে আলাদা মিটিংও হচ্ছে। অতএব আশা করছি পরের বছর ভাল কিছু করে দেখাব।

এত ভাল পারফর্ম করেও বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেলেন না। হতাশ হয়ে পড়েছেন?

একেবারেই না। ইডেন ম্যাচেও তো টুয়েলভ্থ ম্যান ছিলাম। অতএব সুযোগ যে আসবেই সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তা ছাড়া নির্বাচকরা আগে থেকেই বিশ্বকাপের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। আমার মতো নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে কম্বিনেশন ভাঙতে চাননি হয়তো! আরও ভাল খেলতে চাই। ভাল খেললেই সুযোগ আসবে বলে মনে হয়।

যারা ক্রিকেট নিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে, তাদের কী পরামর্শ দেবেন!

ভাল ক্রিকেটার হতে গেলে দরকার হার্ড ওয়ার্ক, বাট ইন আ কারেক্ট ওয়ে। তোমার মধ্যে কতটা ক্ষমতা আছে সেটা তোমাকেই বুঝতে হবে। ঠিক সময়ে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে এবং সেইমতো এগিয়ে যেতে পারলেই সাফল্য আসবে।

রণদেবের দিকে তাকিয়ে ভারত

চারপাশে একটু কান পাতলেই এখন রণদেব বসুর নাম শোনা যাচ্ছে। সৌরভের পর আর-এক বাঙালি রণদেব বসু এখন আমাদের ভরসা। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকেই কি ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন?

না, আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো আমিও ছেলেবেলায় মন দিয়ে পড়াশোনা করতাম। ক্রিকেটের পাশাপাশি টেবল টেনিস, বাস্কেট বল খেলতেও ভালবাসতাম। প্রথম স্কুল সেন্ট লরেন্স।

ঠিক কোন বয়সে ক্রিকেটকেই পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় খুব মন দিয়ে ক্রিকেট খেলতাম। তখনই ঠিক করে ফেললাম ক্রিকেটটাই মন দিয়ে খেলব। তবে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে-সঙ্গে পড়াশোনাটা মন দিয়ে করতাম। আমি বি কম অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিই।

ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোনও পেশা আছে কি আপনার?

কলেজে পড়া শেষ করেই খুব তাড়াতাড়ি চাকরি পেয়ে গেলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে।

পর-পর দু' বার রণজি ফাইনালিস্ট দলের সদস্য আপনি। কীরকম অনুভূতি হচ্ছে?

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ লাগছে। আগের মরশুমেও খুব কম ব্যবধানে ফাইনাল ম্যাচ হেরে গিয়েছিলাম। এবার এত ভাল খেলে ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরে গিয়ে খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। তবে এবার আমরা খুবই ভাল খেলেছি।

পরের বার কি রণজি ট্রোফি কলকাতায় আসছেই?

আশা করছি পরের বার রণজি ট্রোফি কলকাতাতেই আসছে। তা ছাড়া এখন আমরা যেরকম ফর্মে আছি, তাতে আমার মনে হয়, আগামী চার-পাঁচটি ফাইনাল খেলে অন্তত দু'-তিনবার আমরা ট্রোফি জিতবই।

এত ভাল পারফর্ম করার পরও আপনাকে বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া হল না! হাল ছেড়ে দিয়েছেন?

হ্যাঁ, অনেক আশা করেছিলাম বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাব। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া নির্বাচন নিয়ে ভাবা আমার কাজ নয়। আমি যেটা করতে পারি সেটা হল, ভাল পারফরম্যান্স। তবে আমার তো মনে হয়, দেশের হয়ে খেলা যত না কঠিন, তার চেয়েও কঠিন সেখানে টিকে থাকা।

এই গত কালও কেউ বাংলার ক্রিকেটের খবর রাখত না! অথচ আজ সকলেই বাংলা ক্রিকেট নিয়ে চিন্তা করছে। প্রকৃত রহস্যটা কী বলে আপনার মনে হয়?

আগে বাংলা দলে অনেকেরই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ভাল ছিল। দল হিসেবে বাংলা কোনওদিনই সেরকম ভাল খেলতে পারেনি। কিন্তু এখন আমরা সকলেই ভাল খেলছি, বাংলা ভাল খেলছে। হেরে যাওয়া দলকে কেউই পাত্তা দেয় না। আজ আমরা জিতছি, তাই আমাদের নিয়ে সকলে ভাবছে।

বাংলার ক্রিকেট-পড়ুয়াদের কাছে রণদেব এখন 'আইকন'। তাদের কী টিপ্‌স দেবেন?

পড়াশোনা না করে ক্রিকেট নিয়ে স্বপ্ন দেখার কোনও মানে হয় না। আগে নিজের পড়াশোনা, তারপর ক্রিকেট। কারণ, ভাল ক্রিকেট খেলতে গেলেও রীতিমতো পড়াশোনারও দরকার আছে।

রণদেব বসু

সুস্মিতার চোখে স্বপ্ন

অসমের জাতীয় গেম্‌সে ভাল ফল হয়নি সুস্মিতা সিংহরায়ের। দোহা এশিয়াডে যাঁর জন্য যেতে পারেননি, সেই অন্ধ্র প্রদেশের জে জে শোভার কাছেই হেপ্টাথলনে সোনা হারিয়েছেন তিনি। তবে তার জন্য খুব একটা হতাশ নন সুস্মিতা। জাতীয় গেম্‌সের আগে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নিয়ে ফিরেছেন। ওদেশে গিয়ে ব্র্যাঙ্ক লে'র মতো ডেকাথলনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিটের সঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছেন। মে মাসে ওয়ার্ল্ড গ্রাঁ প্রি। এর পরেই আছে এশিয়ান ও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ। লস অ্যাঞ্জেলিসের একটি ইন্ডোর মিটে নেমে হাইজাম্প ও ৬০ মিটার হার্ডল্‌সে সোনা জিতে আসা বাংলার এই প্রতিভাবান অ্যাথলিটের চোখে এখন বড় সাফল্যের স্বপ্ন।

কলকাতায় জুনিয়র টেনিস

একঝাঁক প্রতিযোগীকে নিয়ে কলকাতার সাউথ ক্লাবে বসেছিল 'সানফিস্ট জুনিয়র সুপার সিরিজ' টেনিসের আসর। অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, চণ্ডীগড়, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্নাটক সহ একাধিক রাজ্যের খেলোয়াড়রা সানিয়াদের এই জমজমাট টেনিসযুদ্ধে বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজর কেড়ে নিলেন গুজরাতের সমীপ মেহতা। বালিকাদের সিঙ্গল্‌সে চ্যাম্পিয়ন হলেন দিল্লির শ্বেতা রানা। কলকাতার দুই উঠতি তারকা ত্রেতা ভট্টাচার্য ও ড্যানিয়েল জোন্স জুটি জিতেছেন ডাবল্‌সের খেতাব।

দামি ফুটবলারের দৌড়ে ছোট রোনাল্ডো

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কি এবার বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হতে চলেছেন? পর্তুগালের এই স্ট্রাইকারটিকে ঘিরে কিন্তু তেমন কথাই শোনা যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার দলের কাছ থেকে ছোট রোনাল্ডোকে নিতে স্পেনের বার্সেলোনা নাকি ভারতীয় মুদ্রায় ২৫৮ কোটি টাকা দর দিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ছোট রোনাল্ডোর সাপ্তাহিক আয় ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা। তাঁকে দলে টানতে বার্সেলোনা সপ্তাহে বাড়তি আরও প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা খরচ করতেও রাজি। এর আগেও একবার এই ফুটবলারটিকে নিতে চেয়েছিল বার্সেলোনা। ম্যাঞ্চেস্টার টাকা বাড়িয়ে দলে রেখেছিল রোনাল্ডোকে। এবার কী করে ম্যাঞ্চেস্টার দল সেটাই দেখার। যদিও ছোট রোনাল্ডো বলেছেন, "স্প্যানিশ ফুটবল আমাকে টানে। তবে আমি কোথায় খেলব সেটা ঠিক করবে আমার এজেন্ট। আমি নই।"

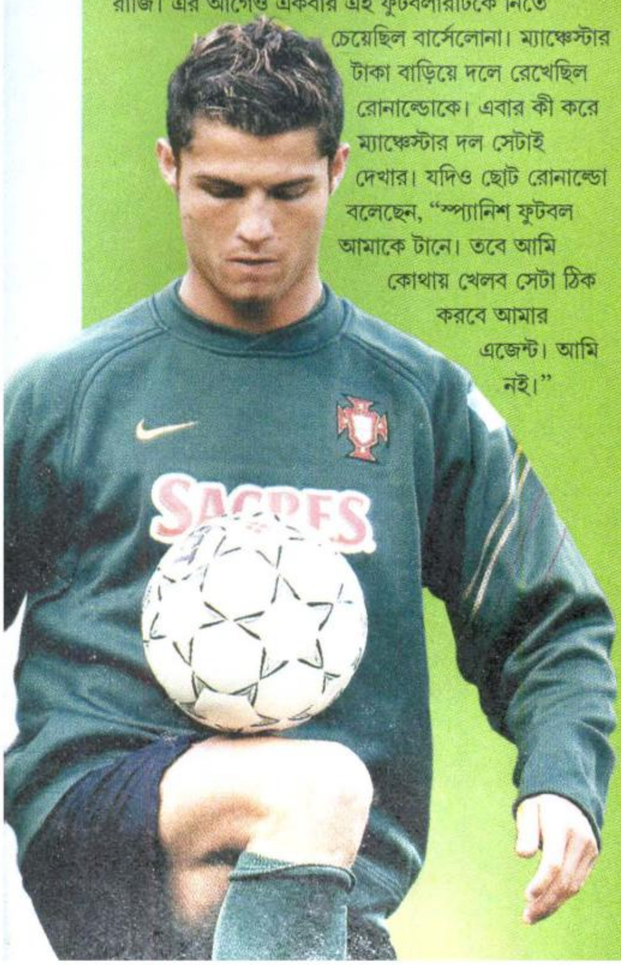

বিশ্বকাপের আগে চ্যালেঞ্জের মুখে বিশ্বজয়ীরা

বেশ চাপের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন রিকি পন্টিংরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজ জিতলেও, দীর্ঘ ১৪ বছর পর দেশের মাঠে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের কাছেই টানা তিন ম্যাচে হেরে পর্যুদস্ত হয়েছেন অজিরা। পরে চ্যাপেল-হ্যাডলি ওয়ান-ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে দলে পন্টিং-গিলক্রিস্ট সহ প্রথম সারির পাঁচ ক্রিকেটার না থাকলেও একেবারে ১০ উইকেটে হেরে তাদের র‍্যাঙ্ক নেমে ২-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথম একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ১০ উইকেটে এবং সিরিজেও পরাজয়। কোমরের চোটে অনেকটাই কাবু রিকি পন্টিং, মাইকেল ক্লার্ক। কাঁধে অস্ত্রোপচার হওয়ায় অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, ব্রেট-লি'র গোড়ালিতে চোট। সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দারুণ চ্যালেঞ্জের মুখে গত দু' বারের বিশ্বজয়ীরা।

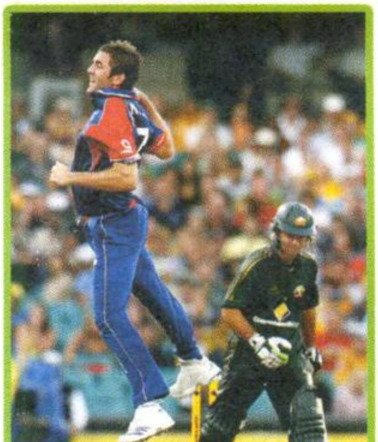

টেলিগ্রাফ স্কুল দাবায় সেরা বিতান

টেলিগ্রাফ স্কুল দাবায় আবার চ্যাম্পিয়ন হল বারুইপুরের বিতান বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নিয়ে পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব দেখাল বারুইপুর হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির এই ছাত্রটি। ইতিমধ্যে বয়সভিত্তিক রাজ্য দাবায় বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সে। দিব্যেন্দু বড়ুয়ার চেজ আকাদেমির শিক্ষার্থী বিতানের আদর্শ দাবাড়ু গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়। জয়ের পর সূর্যশেখরই গোর্কি সদনে বিতানের হাতে পুরস্কার হিসেবে ১৫ হাজার টাকা ও সুদৃশ্য ট্রোফি তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় সেরা স্কুলের পুরস্কার পেয়েছে সেন্ট জেমস।

চন্দন রুদ্র

NEW

Tulsi O_2 fresh

For a healthy germ-free kitchen environment.

Tulsi O_2 fresh is the No.1 selling model in West Bengal.

Pro-ion technology for a healthier kitchen.

The advanced version of the world's first & only Kitchen Environment Processor is the complete health appliance equipped with

• Air Sense Ionizer • Pest Repellent • Electric Chimney

TULSI O_2 FRESH IS AVAILABLE IN BAFFLE FILTER AT NO EXTRA COST.

ULTRAFRESH

KITCHEN APPLIANCES & ACCESSORIES

UTAIL

ULTRAPURE TECHNOLOGY & APPLIANCES INDIA LTD.

GC - 23, 1st Floor, Salt Lake - III, Kolkata, Ph.: 033 - 32956369, 9831223447.

E-mail: info@ultrafreshindia.net, Website: www.ultrafreshindia.net.

SALT LAKE - 9831481335 / 23593260, **ENTALLY** - 9830466964 / 32987977, **CHETLA** - 9831082598 / 24487653, **SHYAMBAZAR** - 9830084497/ 033-329299030, **HOWRAH** - 9433056003/26427961, **GARIA** - 9831711473 /32965418, **SONARPUR** - 9830546003 / 9830796753, **DUMDUM** - 9830998442 / 25292625, **MADHYAMGRAM** - 9830014592 / 25269515, **MUKUNDAPUR** - 9831951511 / 64507083, **BARRACKPORE** - 9830019729 /25947835, **CHANDAN NAGAR** - 9831310725 / 2685 4208, **BARASAT** - 9831616158 / 9830389940, **BEHALA** - 9830490454, **KRISHNAGAR** - 9434371098, **BURDWAN** - 9332127072 / 0342-2551133, **ASANSOL** - 9832133888 / 0341-3291445, **PURULIA** - 9932730756 / 03252-227299, **BANKURA** - 9434480918 / 03242-243265, **HALDIA** - 9832123529, **BAGNAN** - 9434569343, **MIDNAPORE** - 9830466964, **RAIGANJ** - 9933402326 / 9474312693, **MALDA** - 9832477928 / 03512-320004, **COOCHBIHAR** - 9832345662, **SILIGURI** - Mechanical Stores - 9434319149, 0353-3204927, **SODEPORE** - Classic Associates - 9830722565 / 9231437341, **GUWAHATI** - Paltan Bazar - 9954038320 / 9954480935, Atahgon - 9435102306, **DIBRUGARH** - 0373-2320535 / 2322496, **SILCHAR** - 9435171449, 03842-232520, **JALPAIGURI** - 9434217114, **BHUBANESHWAR** - Ganga Nagar - 9437010654, Bapuji Nagar - 9437100042, **SAMBALPORE** - 9437158819, **ROURKELA** - 9437085163, **BALASORE** - 9437112139.

For Direct Sales Franchise enquiries please contact: West Bengal/ Bangladesh - Mr. S.K Dey (GM) - 09339872687, **Sikkim/ North East/ Orissa -** Mr. Ariandam Ghosh - 09831478479, **Bihar / Jharkhand -** Mr. Saurabh Gupta - 09433056003, **Rest of India -** Mr. Diveya Shah - 09810465796

Vermilion Communication/ULTRAFRESH/821

ANANDAMELA MARCH 2007 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

Dabur

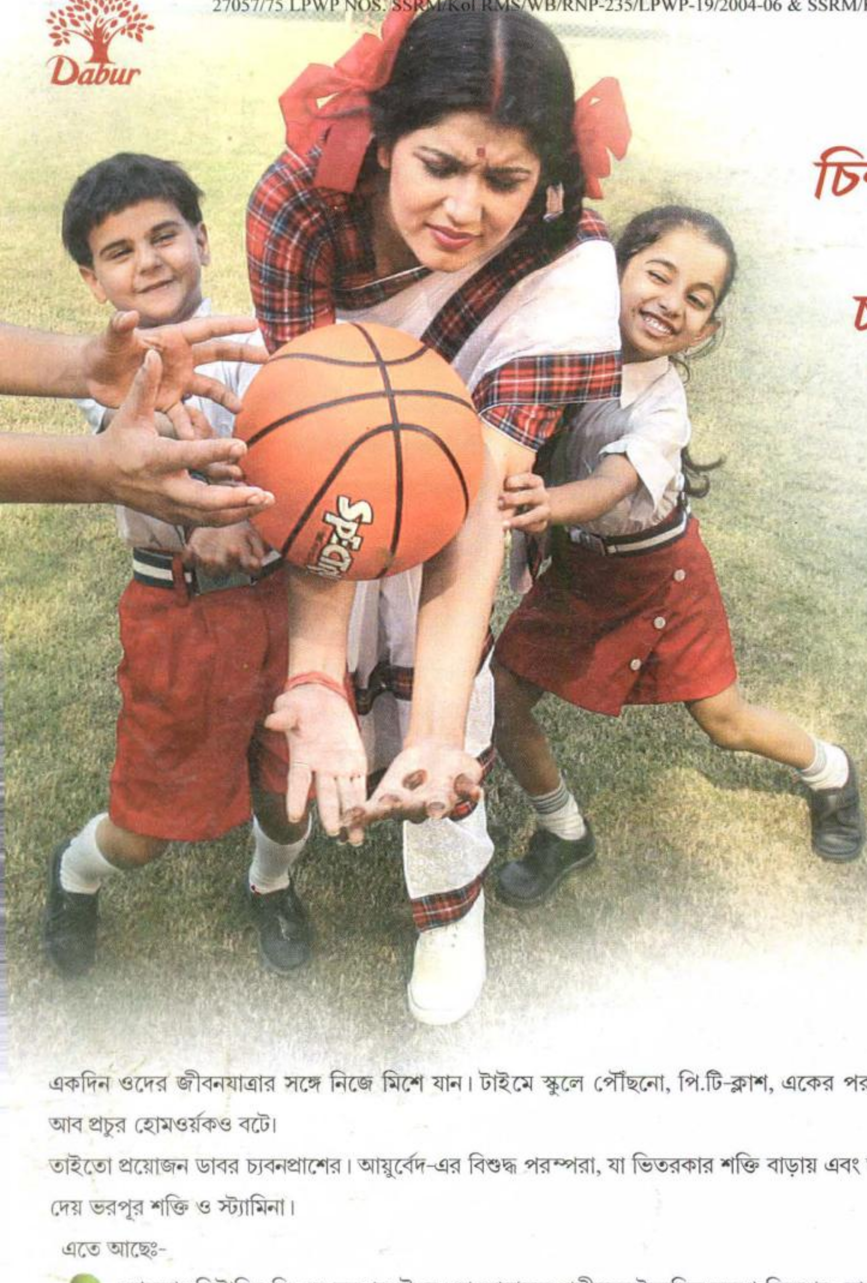

চিন্টুর ডাবর চ্যবন প্রাশের কি দরকার!
চলুন না আজ মা-কেই স্কুলে পাঠানো যাক।

একদিন ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজে মিশে যান। টাইমে স্কুলে পৌঁছনো, পি.টি-ক্লাশ, একের পর এক ক্লাশ, আব প্রচুর হোমওয়র্কও বটে।

তাইতো প্রয়োজন ডাবর চ্যবনপ্রাশের। আয়ুর্বেদ-এর বিশুদ্ধ পরম্পরা, যা ভিতরকার শক্তি বাড়ায় এবং তার সাথেই দেয় ভরপূর শক্তি ও স্ট্যামিনা।

এতে আছেঃ-

আমলাঃ ভিটামিন সি-এর ভরপূর উৎস। যা আমাদের শরীরকে দৈনন্দিন অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচায়। **কৃকটশৃঙ্গীঃ** এটি বার-বার হওয়া সর্দি-কাশি-র জন্য উপকারী।

এ ছাড়া এটি অনেক স্বাস্থবর্ধক উপাদানের অভিনব সংমিশ্রণ। সেজন্য বাচ্চাই হোক বা বড়, ডাবর চ্যবনপ্রাশ প্রত্যেকের জন্যেই খুবই উপকারী। এবার তো নিশ্চয়ই বোঝাগেল যে আপনার চিন্টুর ডাবর চ্যবনপ্রাশ কেন প্রয়োজন।

এবারে ডাবর চ্যবনপ্রাশের নতুন 100 গ্রাম ট্রায়ল প্যাক মাত্র 25 টাকায়।

তাই আপনিও ট্রাই করুন এবং স্কুল না গিয়েই জেনে নিন ডাবর চ্যবনপ্রাশের আপনার কি দরকার।

McCann/DCP/212/07

Dabur Chyawanprash

দরকার আছে!

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে androonishakti@dabur.com তে ই-মেইল করুন, লগ-অন করুন www.dabur.com/chyawanprash অথবা ডাবর চ্যবনপ্রাশ পো.অ.বক্স 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ-201010 কে লিখুন।